দ্বাদশ শ্রেণি

বাংলা

ওয়ার্কবুক

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার।

© এস সি ই আর টি ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা ওয়ার্কবুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২।

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি তৈরি করেছেন

শ্রী সুব্রত মজুমদার, শিক্ষক

শ্রী অনুপ কুমার বিশ্বাস, শিক্ষক

শ্রীমতি ছন্দা মজুমদার, শিক্ষিকা

পরিমার্জনায়

শ্রীমতি এমেলি নাগ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, শিক্ষিকা

শ্রী গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক

দ্বাদশ শ্রেণি বাংলা পাঠ্যক্রম : ২০২০-২০২১

সূচিপত্র

একক - ১ ঃ কবিতা

(১) সবুজের অভিযান (বলাকা) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭

(২) কালবৈশাখী (হেমন্তগোধুলি) - মোহিতলাল মজুমদার ১৯

(৩) নারী (সর্বহারা) - কাজী নজরুল ইসলাম ৩৩

(৪) যুদ্ধ কেন? (কাস্তে) - দিনেশ দাস ৪৯

(৫) আগামী (ছাড়পত্র) - সুকান্ত ভট্টাচার্য ৫৯

একক - ২ ঃ গদ্য

(১) বাহুবল ও বাক্যবল (বিবিধ প্রবন্ধ) - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭০

(২) কবিতা ও বিজ্ঞান (অব্যক্ত) - জগদীশচন্দ্র বসু ৮৬

(৩) অন্নদাদিদি (শ্রীকান্ত-১ম পর্ব) - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৯

(৪) যুগজিজ্ঞাসা (কণ্ঠস্বর প্রবন্ধ) - অন্নদাশঙ্কর রায় ১১৭

একক - ৩ ঃ ছোটোগল্প

(১) শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড (গড্ডালিকা)- পরশুরাম ১৩৩

(২) অযান্ত্রিক (শ্রেষ্ঠগল্প সংকলন) - সুবোধ ঘোষ ১৪৭

একক - ৪ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করে সাধারণ পরিচয় ঃ উইলিয়াম কেরি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার।

মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের সাধারণ পরিচয় ঃ মধুসূদন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭২

গীতিকাব্যের পরিচয় ঃ বিহারীলাল চক্রবর্তী।

কাব্যের সাধারণ পরিচয়/সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ দাশ। ১৮৩

নাটক ঃ মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বিজন ভট্টাচার্য। ১৯৩

কথাসাহিত্য (উপন্যাস ও ছোটগল্প) ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক - ৫ ঃ ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দ

(ক) ধনিতত্ত্ব ঃ স্বরভক্তি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, বর্ণবিপর্যয়, সমীভবন, বিষমীভবন, নাসিক্যীভবন, ধ্বনিলোপ, স্বরাগম, বর্ণদ্বিত্ব, লোকনিরুক্তি।

(খ) ছন্দ ঃ ২২৭

(অ) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ,

(আ) মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

(ই) অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ।

একক - ৬ ঃ প্রবন্ধ রচনা ২৩৯

- আদর্শ প্রশ্নমান

একক - ১ (কবিতা)

সবুজের অভিযান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি: (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তন গর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৫শে বৈশাখ) উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত এবং অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর দান বিস্ময়কর ও অপরিমেয়। কবিতা ছাড়াও ছোট গল্প, উপন্যাস, পত্র সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাহিত্য রাশি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'প্রভাত সংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত' 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'খেয়া', 'পূরবী', 'প্রান্তিক', নৈবেদ্য', 'আরোগ্য', প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ 'Song offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 'জাতীয় সংগীত' এর রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই" এই প্রকৃতি প্রেমী কবির প্রয়াণ ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই অগাষ্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ২২শে শ্রাবন)।

উৎসগ্রন্থ - 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

লেখা ও প্রকাশকাল ঃ- ১৩২১ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে বসে 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি লেখা হয় এবং ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'সবুজপত্র' মাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই কবিতাটি প্রথম প্রকাশ পায়।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

নবীন - নতুন, তরুণ, তুচ্ছ - হীন, নগণ্য; কাঁচা - অপরিপক্ক, পুচ্ছ - লেজ, অবুঝ - যে বুঝেনা, দুরন্ত- অবাধ্য, অশান্ত; মদে - মত্ততায়, দাওয়া - বারান্দা, তর্ক - বিতর্ক, যুক্তি; ঝিমায় - চোখ বন্ধ করে ঢুলতে থাকা, হেলায় - অবজ্ঞায়, বাহিরপানে - বাইরের দিকে, সাঁচা - সত্যি, অকৃত্রিম; হেথায় - এখানে, খাড়া - দণ্ডায়মান, প্রচণ্ড- প্রবল, বিজয়-কেতন - বিজয় পতাকা, ভোলানাথ - যিনি নিজেকে ভুলে থাকেন, মহাদেব; প্রমত্ত - উন্মত্ত, যুবা; বিবাগি - দেশত্যাগী, উদাসীন; আপদ - বিপদ, বক্ষে - বুকে, ঘুচিয়ে দে - দূর করে দে, পুঁথিপোড়া - কেতাবি বিদ্যাধারী বা পুঁথি পড়ুয়া, বিধিবিধান - ঈশ্বরের তৈরি নিয়ম, অফুরাণ - যা শেষ হয়না, জীর্ণ - পুরাতন, দেদার - অনেক, প্রচুর; জরা - বার্ধক্য; তড়িৎ - বিদ্যুৎ, মাল্যগাছা - মালাখানি

সারসংক্ষেপ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সবুজের অভিযান' কবিতায় চিরগতিময় তারুণ্যের অফুরন্ত প্রাণশক্তির জয়গান গেয়েছেন। কবি চিন্তা-চেতনা-মনন পাশ্চাত্য দার্শনিক বেগসঁ-এর গতিতত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। আর তারই ফসল 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ। গতিই জীবন, স্থিতিই মৃত্যু। গতিবাদের এই চিরন্তন সত্যের উপর এই কবিতাটি প্রতিষ্ঠিত।

এই কবিতায় কবি গতির প্রতীক যৌবন এবং স্থিতির প্রতীক প্রবীণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতকে নিখুঁত ভাষায় কাব্যরূপ দান করেছে। যৌবন দুরন্ত, দুর্বার সমস্ত রক্ষনশীলতার কারাগার আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে সে সত্যের পথে এগিয়ে চলে।

অন্যদিকে সমাজের উচ্চাসনে বসা জড়ত্বের পূজারী প্রবীণগণ কুসংস্কারের অচলায়তনে বন্দী। কবির চেতনাই এরা 'আধমরা'। জরাগ্রস্ত প্রবীণরা তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনা বন্ধ করে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো অচল হয়ে সমস্ত প্রগতি ও সামাজিক বিকাশ রুদ্ধ করে বসে আছে।

কবির বিশ্বাস, নব যৌবন দুরন্ত প্রাণশক্তির দুর্বার বেগে এগিয়ে গেলে রক্ষনশীল সমাজ হঠাৎ আলোর ঝলকানি স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাদের মানসিকতার জাগরণ ঘটেবে। বিপদসঙ্কুল অজানা পথে আঘাত এলেও জয়ের লক্ষ্যে বেহিসেবী পথ চলাই যৌবনের আনন্দ। তাই কবি অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরা নবজীবনের বার্তা বাহকদের সমাজের জীর্ণজরাকে সরিয়ে নতুন কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য উদাও আহ্বান রেখেছেন।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১**

১. 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির কবি কে এবং মূলগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর ঃ 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির কবি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মূলগ্রন্থের নাম 'বলাকা'।

২. 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতা?

উত্তর ঃ 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংখ্যক কবিতা।

৪. 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি কখন রচিত হয়?

উত্তর ঃ 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি রচিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ তারিখে।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি মূলত কোন্ ধর্মী?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি মূলত গতিবাদ ধর্মী।

৬. 'সবুজের অভিযান' কবিতায় কবি কোন্ ভোরের কথা বলেছেন?

উত্তর ঃ 'সবুজের অভিযান' কবিতায় কবি 'রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোর'-এর কথা বলেছেন।

৭. 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা' - 'পুচ্ছ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'পুচ্ছ' শব্দের অর্থ হল লেজ।

৮. 'সবুজের অভিযান' কবিতায় কবি কাকে কী নাচাতে বলেছেন?

উত্তর ঃ 'সবুজের অভিযান' কবিতায় কবি নবীন, তরুণ, কাঁচাদের পুচ্ছটিকে উচ্চে তুলে নাচানোর জন্য বলেছেন।

৯. 'খাঁচা খানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়' - খাঁচাখানা কোথায় কীভাবে দুলছে?

উত্তর ঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রবীণ পাকাদের ঘরের দাওয়ায় মৃদু হাওয়ায় খাঁচাখানা দুলছে।

১০. 'চক্ষুকর্ণ ডানায় ঢাকা' - কাদের এমন অবস্থা?

উত্তর ঃ প্রবীণ পরম পাকাদের এমন অবস্থা।

১১. 'ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা' - কার ঝিমানোর কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ পরম পাকা প্রবীণদের ঝিমানোর কথা বলা হয়েছে।

১২. 'তাকায় না যে কেউ' - কে, কোথায় তাকায়না?

উত্তর ঃ প্রবীণরা বাহিরপানে অর্থাৎ বাইরের দিকে তাকায়না।

১৩. মাটির ছেলেরা কী চায়না?

উত্তর ঃ মাটির ছেলেরা মাটির উপর চরণ ফেলে চলতে চায়না।

১৪. 'উচ্চ বাঁশের মাচায়' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর ঃ উচ্চ বাঁশের মাচা বলতে কবি সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবীণদের নিজ ঘরে বন্দি হয়ে থাকার মনোভাবকে বুঝিয়েছেন।

১৫. 'আয় অশান্ত, আয়রে আমার কাঁচা' - কবি কাদের অশান্ত এবং কাঁচা বলে সম্বোধন করেছেন?

উত্তর ঃ কবি নবীন তথা তরুণদের অশান্ত এবং কাঁচা বলে সম্বোধন করেছেন।

নিজে করো ঃ

১৬. 'লাগবে লড়াই' -কীসে কীসে লড়াই লাগবে বলে কবির অভিমত?

উত্তর ঃ

১৭. 'চিরকাল কি রইবে খাড়া?' - কী চিরকাল খাড়া থাকবেনা?

উত্তর ঃ

১৮. 'সবুজের অভিযান' কবিতায় কবি কাকে দুয়ার ভেদ করে আসার আহ্বান জানিয়েছেন?

উত্তর ঃ

১৯. 'আকাশখানা ফেড়ে' -কীভাবে আকাশকে ফাড়ার কথা বলেছেন?

উত্তর ঃ

২০. 'ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা' - কোথা থেকে ভুলগুলো বেছে বেছে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ

২১. 'বিবাগি কর্ অবাধ পানে' - কাকে বিবাগি করতে বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ

২২. 'সবুজের অভিযান' কবিতায় ব্যবহৃত প্রমত্ত এবং প্রমুক্ত শব্দ দুটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ

২৩. 'ঘুচিয়ে দে, ভাই পুঁথিপোড়ার কাছে' - পুঁথিপোড়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ

২৪. 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী' - কবি কাদের চিরযুবা ও চিরজীবী বলে সম্বোধন করেছেন?

উত্তর ঃ

২৫. 'সবুজের অভিযান' কবিতায় 'সবুজ' কীসের প্রতীক?

উত্তর ঃ

২৬. 'সবুজের অভিযান' কবিতায় কোন্ ফুল এবং কোন্ ঋতুর কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ

২৭. কীসের নেশায় 'ভোর করেছিস ধরা' বলেছেন কবি?

উত্তর ঃ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩**

১. 'চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা'- কোন্ রচনার অংশ? কাদের উদ্দেশ্যে কবির এই অভিমত? এইরূপ উক্তির কারণ কী?

উত্তর ঃ আলোচ্য অংশটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সবুজের অভিযান' কবিতার অংশ।

কবি এখানে প্রবীণ ও পরম পাকা, যারা জরা জীর্ণগ্রস্ত ও সংস্কারাচ্ছন্ন সনাতনী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তাদের উদ্দেশ্য করে এই উক্তিটি করেছেন।

গতানুগতিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী প্রবীণরা স্থবির ও গতিহীন, সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা থেকে কখনো নিজেদের বের করতে পারেনা। তারা নিজেদের তৈরি করা সংকীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকতে চায়। অথচ তাদের চিন্তাধারার বাইরে যে প্রগতিশীল ও আধুনিকতার জোয়ার বইছে তাতে তাদের কোনো লক্ষ্য নেই। বাইরের আধুনিকতা তাদের প্রাচীনতম চিন্তাভাবনায় কোনো আঘাত হানতে পারেনা। কারণ তাঁদের চোখ কান যেন সংকীর্ণ, প্রাচীনতম চিন্তাধারার ডানা দিয়ে ঢাকা। তাই কবি প্রবীণদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলেছেন।

২. 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী'

- কোন্ কবিতার অংশ? চিরযুবা ও চিরজীবী বলার কারণ কী?

উত্তর ঃ উপরিউক্ত লাইনটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর লেখা 'সবুজের অভিযান' কবিতার অংশ।

'সবুজের অভিযান' কবিতায় কবি যৌবনের বন্দনা করেছেন। তিনি মূলত নবীন, তরুণ প্রাণশক্তিকে চিরযুবা ও চিরজীবী বলে অভিহিত করেছেন। তরুণরা তাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে প্রবীণদের গতিহীন, সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণাকে সরিয়ে সেখানে আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে কবির বিশ্বাস। যুবকরাই তাদের অসীম প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে জরা জীর্ণতাকে ঘুচিয়ে দিতে পারবে এবং সমাজকে সংস্কারমুক্ত করতে পারবে। এই কারণেই কবি নবীনদের চিরযুবা ও চিরজীবী বলে অভিহিত করেছেন।

নিজে করো : (মান - ৩)

৩. 'আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' - কাদের আধমরা বলা হয়েছে? কবির এইরূপ উক্তির কারণ কী? ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ

৪. 'শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদি/ চিরকাল কি রইবে খাড়া!' -উপরিউক্ত লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৩

উত্তর ঃ

৫. "বসন্তে-রে পরাস আকুল-করা
"আপন গলার বকুল মাল্যগাছা" -কোন্ কবিতার অংশ? লাইন দুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ

৬. 'লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়' - 'মিথ্যা এবং সাঁচায়' লড়াই লাগার কারণ কী? ৩

উত্তর ঃ

৭. 'পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা'

- কবি কাকে, কেন পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচাতে বলেছেন? ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ

৮. 'আন্‌রে টেনে বাঁধা পথের শেষে'

- কবি কাকে বাঁধা পথের শেষে টেনে আনার জন্য বলেছেন? ৩

উত্তর ঃ

৯. 'বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ'

- কবি কার সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন? এরূপ উক্তির কারণ কী? ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ

১০. 'সবুজের অভিযান' কবিতার প্রতিটি স্তবকে নবীনদের কবি যে যে নামে সম্বোধন করেছেন তা লেখো। ৩

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্ন **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫**

১. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সবুজের অভিযান' কবিতায় নবীণ ও প্রবীণদের মধ্যে যে সংঘাতময় চিত্র তুলে ধরেছেন তা কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।

অথবা

'সবুজের অভিযান' কবিতা অবলম্বনে নবীন ও প্রবীণদের স্বভাবধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর ঃ গতিবাদের কাব্য 'বলাকা' এর একটি অসাধারণ কবিতা 'সবুজের অভিযান'। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবীনদের জয়গান করেছেন। আর নবীনদের জয়গান করতে গিয়ে তিনি প্রবীণ, পরমপাকাদের সাথে নবীন অর্থাৎ তরুণদের সংঘাতময় চিত্র তুলে ধরেছেন। কবিতায় কবি প্রবীণ ও নবীনদের নানা বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ ইত্যাদির এক সুন্দর চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কবি তাঁর কবিতার শুরুতেই নবীনদের সবুজ, কাঁচা, অবুঝ বলে সম্বোধন করে গতানুগতিক চিন্তাধারার অধিকারী প্রবীণ আধমরা ব্যক্তিদের ঘা মেরে বাঁচাতে বলেছেন। কবির মতে, প্রগতিশীল সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে নবীনদের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে, আর তা তিনি দৃঢ় চিত্তে স্বীকার করেছেন। সমকালের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কবি নবীনদের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের প্রমত্ত, প্রচন্ড, উন্মত্ত, অশান্ত, অমর ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছেন। কবির মতে - 'আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা'।

আবার অন্যদিকে কবি প্রবীণদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণকে নবীনতার বিরোধী রূপ দিয়েছেন কবিতায়। প্রবীণরা সংস্কারাচ্ছন্ন, যুক্তিহীন, অনড়, অচল, জরাগ্রস্ত এবং রক্ষণশীলতা খাঁচায় বন্দি জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত। তাই কবি বলেছেন - "অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়"। কবির মতে প্রবীণদের চোখ-কান যেন ডানায় ঢাকা। প্রগতিশীলতার জোয়ার যেন তারা দেখতে পাননা। তাঁরা তাদের তৈরি করা উচ্চ বাঁশের মাচায় অর্থাৎ সংস্কারের দেয়াল তুলে নিজেদের আবদ্ধ করে আপন মনে ঝিমোচ্ছে। কবির ভাষায় -

'আছে অচল আসনখানা মেলে

যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়'

নবীনরা চায় সমস্ত রকমের বাঁধা থেকে মুক্তি, তারা গতির প্রতীক। আর প্রবীণরা তার উল্টো অর্থাৎ অচল, অনড় ও স্থিতিশীলতার প্রতীক। নবীনরা সমাজের কুসংস্কার, সনাতন ধারণা, গতিহীনতাকে এবং সংকীর্ণতাকে দূর করে এগিয়ে যেতে চায়, সেখানে প্রবীণরা প্রথাগত জীবন ও কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়। তাই নবীনদের নানা গতিময় কাজে বাধার সৃষ্টি করে প্রবীণরা। আর তখনই সংঘাতময় চিত্র ফুটে উঠে।

কিন্তু কবির বিশ্বাস প্রবীণদের যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারের দেয়াল চিরকাল খাড়া থাকবেনা। সেই দেয়ালকে নবীনরা তাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির মাধ্যমে ভেঙে দিয়ে নতুন কর্মতৎপর পৃথিবী সমাজকে উপহার দেবে।

নিজে করো ঃ (মান - ৫)

২. 'চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা' - কোন্ রচনার অংশ? কাদের চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা? কবির এইরূপ উক্তির কারণ কি? ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

৩. 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী' -পঙ্‌ক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? চিরযুবা কারা? তারা কীভাবে চিরযুবা এবং চিরজীবী হয়ে থাকবেন বলে তুমি মনে করো। ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

৪. "শিকল-দেবীর ওই-যে পূজাবেদি
চিরকাল কি রইবে খাড়া!" -শিকলদেবীর পূজাবেদি বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? এই পূজাবেদি চিরকাল খাড়া থাকার ব্যাপারে কবি সংশয় প্রকাশ করেছেন কেন? ১+৪=৫

উত্তর ঃ

৫. "আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা" -কোন্ রচনা থেকে উদ্ধৃতাংশটি নেওয়া হয়েছে? কাঁচা বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে। লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

৬. 'সবুজের অভিযান' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর ঃ

*****

একক – ১ (কবিতা)

কালবৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

কবি পরিচিতি (১৮৮৮ – ১৯৫২)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন ২৬ অক্টোবর, ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার কাচড়া পাড়ায়, মামার বাড়িতে। বাবার নাম নন্দলাল মজুমদার, মা হেমলতা দেবী। তাঁর বাবা ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ, তাই মোহিতলাল মামার বাড়ীর কাছে হালিশহর স্কুলে বাল্যশিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন।

রবীন্দ্র সমকালে রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র সুরে কাব্য রচনা করে নিজস্ব কবিকল্পনা ও কাব্যনির্মাণ কৌশলে বিশিষ্ট কবি মোহিতলাল রবীন্দ্রযুগেরই একজন স্বতন্ত্র কবি।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থাবলী হল - 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্বপন পসারী' (১৯২২), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১), 'স্মরগরল' (১৯৩৬) ইত্যাদি। 'ছন্দ চতুর্দশী' তাঁর উল্লেখযোগ্য সনেট সংকলন। মোহিতলাল মজুমদার ১৯৫২ সালের ২৬ জুলাই পরলোকগমন করেন।

'কালবৈশাখী' কবিতাটির উৎসগ্রন্থ ঃ

'কালবৈশাখী' কবিতাটি 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১ খ্রিঃ) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

কালবৈশাখী - চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকালবেলার প্রচন্ড ঝড়সহ বৃষ্টি, নয়ন - চোখ,

ধরণি - পৃথিবী, কানন - বন, অরণ্য; ছত্র - ছাতা, আনন - বদন, মুখ; পাণ্ডুর- বিবর্ণ, বনস্পতি - বড় গাছ, হরি - হরণ করা, নিস্পন্দ - স্পন্দনহীন, নিমেষ - চোখের পলক, পশিয়াছে - প্রবেশ করেছে, মরুৎ পাথার - বায়ু সমুদ্র, ভীমকুন্ডল - বৃহৎ কর্ণাবরণ, কর্ণভূষণ; আকাশ কটাহ - আকাশরূপ কড়াই, ধাইছে - তেড়ে আসছে, মিহির - সূর্য, নাসাগর্জন - নাকের ডাক, নির্ঘোষ - ধ্বনি, শব্দ; অঙ্কুশ - চাবুক, হস্তি তারণ যন্ত্রবিশেষ; পিঙ্গল - হলুদ বর্ণ, রণদুন্দুভি - যুদ্ধের বাদ্য, দ্যুলোক - স্বর্গলোক, বিটপী - শাখা-প্রশাখা যুক্ত গাছ, নভ - আকাশ, টংকার - ধনুকের ছিলার শব্দ, মেঘকজ্জল-মেঘের কাজল, কালোমেঘ; দুর্ধর্ষ - পরাক্রমী, পিনাক - শিবের ধনুকের নাম, কালপুরুষ - নক্ষত্র, কবিতায় কালের গতি নিয়ন্ত্রক পুরুষ, গিরিনিভ - পাহাড়সম।

সারসংক্ষেপ

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'কালবৈশাখী' কবিতায় কালবৈশাখীর এক অপূর্ব বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কবিতার শুরুতেই অপরাহ্ণকালীন ঝড়ের ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠেছে কবির ভাষায় -

"মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে!

ধরণির পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে!"

হঠাৎ করে দুপুরের সূর্য ঢাকা পড়ে, অরণ্যের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যেন জল-স্থলের নিঃশ্বাস হরণ করে। সকল বৃক্ষরাজিরা যেন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে স্পন্দনহীনভাবে নিমেষ বা চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে। চারিদিকে বাতাসের সমুদ্রে যেন বারুদের গন্ধ। কবিতায় আকাশকে একটি কড়াই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে ধুয়োরঙের মেঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। যেন জটাধারী কোনো মুখচ্ছবি সূর্যকে গ্রাস করার জন্য অসীম অতল ভেদ করে এগিয়ে আসছে। এই ভীমমূর্তির নাসাগর্জন শুনা যাচ্ছে, তার গলতলদেশ যেন পিঙ্গল বর্ণ (হলুদ) এবং উন্মাদের মতো তার বেশ। উন্মাদের মতো বেশের কারণে যেন মনে হচ্ছে আকাশকে দিগহস্তীরাও দাঁত দিয়ে চিড়ে ফেলছে। তাই যেন যুদ্ধবাদ্যের বাজনা শুনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের কোনো পথে দুই মহাবলীর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

তবুও যেন ঝড়ের আগমনকে অদ্ভুত উল্লাসের সাথে তুলনা করেছেন কবি। কবির মতে -

"হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যায় অদ্ভুত উল্লাসে।"

কালবৈশাখীর আগমনে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তবুও এই কালবৈশাখী প্রাণে

আশার সঞ্চার করে। কেননা সে চৈত্রের চিতা ভস্ম উড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর জ্বালা মেটানোর চেষ্টা করে। পৃথিবীর মাটিতে যেন মধু জোগায়। কবির মতে, কালবৈশাখী যেন পিনাক পাণি। তিনি রুদ্র। তিনি ধ্বংসের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করেন। আর সেই কারণে কালবৈশাখীর আগমনে তার বিভিন্ন কার্যাবলীকে কবি শুভকীর্তির সাথে তুলনা করেছেন। কবি বলেছেন-

"তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির"

তাছাড়া ভীষণাকৃতির কালবৈশাখীর ঝড়কে নিয়েও যেন পৃথিবীর আনন্দের শেষ নেই। কারণ তার মধ্যে (কালবৈশাখীর) নিহিত আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১**

১. 'কালবৈশাখী' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উত্তর ঃ 'কালবৈশাখী' কবিতাটি 'হেমন্তগোধূলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

২. কালবৈশাখী বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ কালবৈশাখী বলতে চৈত্র-বৈশাখ মাসের অপরাহ্ন-কালীন ঝড়-ঝঞ্ঝাকে বোঝায়। (কাল অর্থাৎ অশুভ, অমাঙ্গলিক, ঝড়ঝঞ্ঝাকে সাধারণত অমঙ্গলার্থে দেখা হয় বলে বৈশাখী এই ঝড় কালবৈশাখী নামে পরিচিত)

৩. মধ্যদিনের রক্ত নয়ন বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ মধ্যদিনের রক্ত নয়ন বলতে মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর দীপ্তিকে বোঝানো হয়েছে।

৪. মধ্যদিনের রক্ত নয়ন কে অন্ধ করেছে?

উত্তর ঃ মধ্যদিনের রক্ত নয়ন কালবৈশাখী অন্ধ করেছে।

৫. আলয়ে কুলায়ে তন্দ্রাহীনতার কারণ কী?

উত্তর ঃ প্রচণ্ড ঝড়ের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে মানুষ ও সমস্ত প্রাণীকুল নিদ্রাহীন অবস্থায় রয়েছে।

৬. জলস্থলের নিঃশ্বাস কে হরণ করেছে?

উত্তর ঃ কালবৈশাখী জলস্থলের নিঃশ্বাস হরণ করেছে।

৭. 'নিমেষ গনিছে তাই কি তারা সারি সারি নিস্পন্দ'- নিমেষ গণনা বলতে কী বোঝায়? কে 'নিমেষ গনিছে'?

উত্তর ঃ 'কালবৈশাখী' কবিতায় নিমেষ গণনা বলতে চলতি কথায় সময় গণনা বোঝালেও নিমেষ গণনা হল চরমমুহূর্তের জন্য সময় গণনা করা। বনস্পতিরা নিমেষ গণনা করছে।

৮. 'কানন-আনন পান্ডুর করি' - এ কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ কালবৈশাখীর ভয়াভয়তার শঙ্কায় অরণ্যের গাছপালার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যাওয়া হল উক্ত কথাটির অর্থ।

৯. "আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে।"- 'আলয়' ও 'কুলায়' কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'আলয়' কথার অর্থ মানুষের বাড়িঘর আর 'কুলায়' বলতে বোঝায় পাখির বাসা।

১০. 'নিমেষ গনিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ?' - কে 'নিমেষ গনিছে'?

উত্তর ঃ অরণ্যের বনস্পতিসমূহ এখানে নিমেষ গণনা করছে।

১১. 'মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ' - 'মরুৎ' ও 'পাথার' শব্দের অর্থ কী? 'মরুৎ-পাথার' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর ঃ 'মরুৎ' শব্দের অর্থ হল বায়ু আর 'পাথার' শব্দের অর্থ হল সমুদ্র।

কবি 'মরুৎ পাথার' বলতে কালবৈশাখীর সমাগম লগ্নে প্রবাহিত বায়ুর সমুদ্রকে বুঝিয়েছেন।

১২. "পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ?" - 'পশিয়াছে' কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'পশিয়াছে' কথার অর্থ প্রবেশ করেছে।

১৩. "হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা" - 'আকাশকটাহ' কী?

উত্তর ঃ 'আকাশকটাহ' শব্দের অর্থ -আকাশ কড়াই। আকাশকে এখানে বিশাল কড়াইয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১৪. "অথবা ও কিরে সচল অচল" - 'সচল অচল' বলতে কী বোঝো?

উত্তর ঃ এখানে 'অচল' অর্থে পর্বত। এই মর্মে 'সচল অচল' কথার অর্থ - চলমান পর্বত।

১৫. "ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মিছটা" - এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ এখানে কালবৈশাখীর আগমন লগ্নে আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের কথা বলা হয়েছে।

১৬. "দুলিয়া উঠিল জটাভার" - কার জটাভার?

উত্তর ঃ কালবৈশাখী যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে অর্থাৎ পুঞ্জীভূত মেঘে যে রূপধারণ করেছে তা-ই কবি কল্পনায় কারও মাথার জটাভার।

১৭. "পিঙ্গল হল গলতলদেশ" - কার গলতলদেশ কেমন?

উত্তর ঃ পিঙ্গল মানে পীত আভাযুক্ত রক্তবর্ণ। কবির মতে ভীমকুন্ডল জটাধারী কোনো দীর্ঘদেহীর গলতলদেশ পিঙ্গল।

১৮. "ধূলিধূসরিত উন্মাদবেশ" - কার বেশ উন্মাদ?

উত্তর ঃ কবির মতে কালবৈশাখীরূপী কুন্ডলাকৃতি জটাধারীর বেশ ধূলিধূসরিত উন্মাদের মতো।

১৯. অঙ্কুশ কী? কবিতায় অঙ্কুশ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ 'অঙ্কুশ' হল মাহুতের ব্যবহৃত হস্তিতাড়ন যন্ত্রবিশেষ।

কবিতায় অঙ্কুশ বলতে আকাশচেরা বিদ্যুৎরেখাকে বোঝানো হয়েছে।

২০. 'দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণিবন্ধন সন্ধ্যার' - সন্ধ্যার বেণিবন্ধন কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর ঃ কালবৈশাখীর পুঞ্জীভূত মেঘসঞ্চারকে কবি 'সন্ধ্যার বেণিবন্ধন' বলে অভিহিত করেছেন।

২১. "দিগ্‌বারনেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভদন্তে।" - লাইনটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ দিগ্‌বারনেরা অর্থাৎ দিক্‌হস্তীরা বেদনায় অধীর হয়ে তাদের দাঁত দিয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করছে।

২২. "বাজে ঘন ঘন রণদুন্দুভি" - 'রণদুন্দুভি' কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'রণদুন্দুভি' কথার অর্থ যুদ্ধবাদ্য। কবিতায় কালবৈশাখীর গুরুগর্জনকে রণদুন্দুভির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২৩. "যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে" - কোন্ দুই মহাবলের কথা কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর ঃ দুই মহাবলের মধ্যে একজন হল বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র এবং অন্যজন হল অনাবৃষ্টির অধীশ্বর অসুর।

নিজে করো ঃ (মান - ১)

২৪. বঙ্কিম নীল অসির ফলকে কার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে?

উত্তর ঃ

২৫. আলোকের মুখে কী ছিন্ন হল?

উত্তর ঃ

২৬. নববর্ষের পুণ্যবাসরে কী আসে?

উত্তর ঃ

২৭. "ম্লান হয়ে আসে মেঘকজ্জল" - 'মেঘকজ্জল' কী? কীভাবে তা ম্লান হয়ে আসে?

উত্তর ঃ

২৮. "জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর" -পৃথ্বীর জ্বালাটা কী?

উত্তর ঃ

২৯. 'ধৌত ধরার পঙ্ক' - কথাটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ

৩০. 'হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে' - 'সে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ

৩১. 'শুনি টংকার তাহার পিনাকে' - 'পিনাক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ

৩২. 'ধরায় ধরেনা হর্ষ' - কার আগমনে ধরায় আনন্দে ভরে উঠে?

উত্তর ঃ

৩৩. "চমকিয়া উঠি-তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির" - বক্তা এখানে কার, কোন্ শুভকীর্তির কথা ঘোষণা করেছেন?

উত্তর ঃ

৩৪. "ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ"- 'ওরি মাঝে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ

৩৫. "নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া" -পঙক্তিটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ

৩৬. "তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে" -এখানে কোন্ আশ্বাসের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ

৩৭. মরুৎ পাথারে আজ কীসের ঘ্রাণ?

উত্তর ঃ

৩৮. 'কানন-আনন পান্ডুর করি' - 'পান্ডুর' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩**

১. 'আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ' - 'আজিকে' বলতে কোন্ দিনের কথা বোঝানো হয়েছে? বনস্পতির ভাগ্য মন্দ বলার কারণ কী? ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ কবি মোহিতলাল মজুমদারের লেখা 'হেমন্ত গোধূলি' কাব্যের অন্তর্গত 'কালবৈশাখী' কবিতায় 'আজিকে' বলতে কবি কালবৈশাখী যেদিন সমাগত, সেদিনের কথা বুঝিয়েছেন।

কবি তাঁর কবিতাতে কালবৈশাখী ঝড়ের এক ভয়ংকর মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন। তাছাড়া কবিতায় বনস্পতি বলতে বনের শোভা বর্ধনকারী বৃক্ষকে বুঝিয়েছেন, যাদের ভাগ্য মন্দ বলা হয়েছে। আসলে আকস্মিক প্রবল ঝড়ের তান্ডব এক প্রলয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করে। মূলত বনের বড় বৃক্ষরাজিরা এই প্রবল ঝড়কে বাধা দেয় এবং তার ফলশ্রুতিতে বড়ো বনস্পতিদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কবিতায় কালবৈশাখীর আগমনকে এত প্রকটভাবে দেখানো হয়েছে তাতে করে জীবকুল ও উদ্ভিদকুল যেন ভীত সন্ত্রস্ত ও স্বাভাবিক রূপ হারিয়ে ফেলেছে। বনস্পতিরা এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর বনস্পতিদের এই অসহায় অবস্থা দেখে কবি বর্ণনা করেছেন - "আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ"।

২. "হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে"

- 'সে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কবির এই ধরনের উক্তির কারণ কী? ১+২= ৩

উত্তর ঃ উদ্ধৃতাংশে 'সে' বলতে কবি কালবৈশাখীকে বুঝিয়েছেন।

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'কালবৈশাখী' কবিতায় রুদ্রমূর্তিরূপী কালবৈশাখীকে ভীষণ বলেছেন। তাকে ভীষণ বলার কারণ হল তার তাণ্ডবে লোকালয় ও বনজঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তিকে দেখে প্রাণীকূল ও উদ্ভিদজগৎ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কালবৈশাখীর নানা ভয়ালরূপ প্রদর্শিত হওয়ার পর তার মঙ্গলময় মূর্তির প্রকাশ ঘটে। কালো মেঘের মুখ ম্লান হয়ে যায় আকাশের বাঁধ-ভাঙা জলে, আকাশের স্বাভাবিকতা ফিরে আসে এবং বিটপীর দলও নির্ভয়ে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে। মূলত কালবৈশাখী ধ্বংসাত্মক হলেও তার মধ্যে নিহিত থাকে নবসৃষ্টির অঙ্কুর। আর তাই কবি অদ্ভুত উল্লাসে বলে উঠেছেন -

" হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে"।

নিজে করো ঃ (মান - ৩)

৩. "যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে।" - কোন্ দুই মহাবলের কথা কবি উল্লেখ করেছেন? কবির এরূপ উক্তির কারণ কী?

উত্তর ঃ

৪. "আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিঃশ্বাসে নিঃশঙ্ক।"-উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৩

উত্তর ঃ

৫. "অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক হতে দিক-অন্তে। অঙ্কুশ কী? এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৬. "ওরি মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ"-"ওরি মাঝে" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? 'কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন তা লেখো। ১+২=৩

উত্তর ঃ

৭. "ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ" - কোন রচনার অংশ? এরূপ উক্তির কারণ কী? ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ

৮. "দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণিবন্ধন সন্ধ্যার" - প্রসঙ্গসহ পংক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৩

উত্তর ঃ

৯. "চমকিয়া উঠি-তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির" - কে, কী কারণে চমকে উঠেন? কবি কেন তার সেই শুভকীর্তির জয়গান গেয়েছেন? ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ

১০. "নিমেষ গনিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ?"- কে নিমেষ গণনা করছে? লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১ + ২ = ৩

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্ন **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫**

১. কবি মোহিতলাল মজুমদার কালবৈশাখীর যে রূপমূর্তি কল্পনা করেছেন তাঁর বর্ণনা দাও। **অথবা,** 'কালবৈশাখী' কবিতায় কবি কালবৈশাখীর রুদ্র রূপের মাঝে যে মঙ্গলময় মূর্তি কল্পনা করেছেন, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'কালবৈশাখী' কবিতায় কালবৈশাখীর ভয়াবহ রূপের মধ্যে এক মঙ্গলময় মূর্তির কল্পনা করেছেন। কবির কবিতার প্রথম পর্বে কালবৈশাখীর তাণ্ডব ও ভয়াবহতা এবং রুদ্ররূপী মূর্তির যে বিবরণ পাই তা কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে আমরা আর দেখতে পাইনা। দ্বিতীয় পর্বে আমরা কালবৈশাখীর এক শান্ত, স্নিগ্ধ, মঙ্গলময় রূপই দেখতে পাই।

কবিতার প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই কালবৈশাখীর আগমনের প্রাক্‌লগ্নে প্রকৃতিতে যেন থমথমে ভাব বিরাজ করছে। জীবকুল ও উদ্ভিদকুলের যেন নিঃশ্বাস হরণ করে নেওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে। বড়ো বড়ো বৃক্ষরাজিরা প্রবল ক্ষতির সম্ভাবনার কথা ভেবে যেন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই কবি বলেছেন - "নিমেষ গনিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ?" কবির মতে আকাশ কটাহে ধুয়ো রঙের মেঘের সমাহার যেন ভীম কুন্ডল জটাধারী মূর্তির রূপ ধারণ করেছে। সে ভয়াবহ মূর্তিটি সচল কিংবা অচল সঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। সে যেন সূর্যকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। চারিদিকে তার নাসা গর্জন শোনা যাচ্ছে। শিবের মূর্তির মতো সে যেন জটা দুলিয়ে নৃত্য করছে উন্মাদের মতো। মাঝে মাঝে রণদুন্দুভির শব্দও ঢাকা পড়ছে কালবৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডবে। তাই কবির মতে,-

"যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে!"

দুই মহাবলীর যুদ্ধের পর যেন অনাবৃষ্টির অধীশ্বর পরাজিত হয়ে বাঁধ ভাঙা জল নিয়ে আসে পৃথিবীতে, যাতে করে মেঘকজ্জল কিছুটা ম্লান হয় এবং কালবৈশাখী যেন তার রণবাহিনী নিয়ে বিজয় শঙ্খ বাজাতে বাজাতে প্রস্থান করে।

কিন্তু কবিতার শেষ পর্যায়ে কালবৈশাখীর ভয়াবহতার অবসানের দিক আমরা লক্ষ্য করি। এই তান্ডবলীলার সমাপ্তিতে আকাশ হয়ে ওঠে নির্মল ও পরিষ্কার। পৃথিবীর সমস্ত কাদামাটি ধুয়ে যায়, পৃথিবী নতুনরূপে প্রকাশিত হয়, স্নিগ্ধতায় ও রসে সিক্ত হয়। বনস্পতিরা নিঃশঙ্ক হয়। তাই কবির মতে -

"আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিঃশ্বাসে নিঃশঙ্ক।"

কবি নববর্ষের পুণ্যবাসরে আসা কালবৈশাখীর রুদ্ররূপের মাঝে তার মঙ্গলমূর্তিটিকে খুঁজে পেয়েছেন। বোঝা যায় কালবৈশাখীর কল্যাণে পৃথিবী যেন তার তপ্ত জ্বালার অবসান ঘটিয়েছে। মাটি সরস হয়ে উঠেছে। এ যেন কালবৈশাখীর মঙ্গলময় মূর্তিরই প্রতিচ্ছবি। আর সেই কারণে কালবৈশাখীর রুদ্ররূপের মাঝে অদ্ভুত উল্লাস খুঁজে পেয়েছেন কবি। কবি তাই বলেছেন - 'হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে"। এইভাবেই কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কবিতায় কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তির মধ্যে পৃথিবীর মঙ্গলময় প্রতিচ্ছবিকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

নিজে করো ঃ (মান - ৫)

২. "ওরি মাঝে আছে কাল পুরুষের সুগভীর পরামর্শ" - কোন্ রচনার অংশ? 'কালপুরুষ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'সুগভীর পরামর্শ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

৩. 'কালবৈশাখী' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর ঃ

৪. "যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে!"
- দুই মহাবল কে কে? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+৪=৫

উত্তর ঃ

৫. "মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে!"
- 'মধ্যদিনের রক্ত নয়ন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কে 'মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ' করল? এর মাধ্যমে কবি কোন্ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন? ১+১+৩=৫
উত্তর ঃ

৬. "এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি ধরায় ধরে না হর্ষ।"
- এখানে ভীষণ কে? কাকে দেখে কেন ধরায় হর্ষ ধরে না, আলোচনা করো। ১+৪=৫
উত্তর ঃ

*****

একক – ১ (কবিতা)

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি (১৮৯৯ - ১৯৭৬)

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ১১ জ্যৈষ্ঠ) এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন। তাঁর বাল্যনাম ছিল 'দুখু মিঞা'। অতি দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কবির শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। গ্রামের পাঠশালায় ও মক্তবে তিনি বাংলা আরবি ও ফারসি ভালোভাবেই শিখেছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। অভাবে পড়ে নজরুল মাত্র তেরো বছর বয়সে গ্রামে লেটো গানের দলে যোগ দেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গানের গলা ছিল এবং তিনি গানও বাঁধতে পারতেন। লেটো দলে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই কবিয়াল গায়ক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচিত গানগুলি লোকের মুখে মুখে থাকত। কবিতা-নাটক প্রভৃতি রচনাতেও তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন।

গ্রামের মক্তব থেকে নজরুল প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন। এরপর রাণিগঞ্জের সিয়ারসোল হাই স্কুল, মাথরুন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালি রেজিমেন্টে ভর্তি হন। তারপর সেনাবাহিনিতে যোগ দিতে করাচি যান। হাবিলদার পদে তিনি সৈন্যাবাসে কাল যাপন করলেন। সৈনিক জীবনে তাঁর কবিত্ব শক্তির স্ফূরণ ঘটেছিল গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে। তাঁর রচনার বিভিন্ন দিক যেন বাংলার সাহিত্য ভান্ডারকে পূর্ণ করে চলছিল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। তাঁর 'কারা ঐ লৌহ কপাট/ভেঙে ফেল কর রে লোপাট' প্রভৃতি উদ্দীপক সংগীতকে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ভয় পেত। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। মানুষ নজরুল ছিলেন অতি সরল ও অমায়িক। তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিনী' পদক দান করে। রবীন্দ্রভারতী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান করেন। কিন্তু নজরুলের জীবনের শেষ অধ্যায় ভীষণই করুণ। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে কবি বাক্ শক্তি হারান। কবির মৃত্যুর আগেই তাঁর স্ত্রী প্রমীলা দেবীর মৃত্যু হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার নাগরিকাধিকার দেন। ২৯ শে আগষ্ট ১৯৭৬ সালে কবির রণক্লান্ত জীবন দীপ নির্বাপিত হল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় কবি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

উৎস

কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাম্যবাদী' পর্যায়ের ষষ্ঠ সংখ্যক কবিতা হল 'নারী'।

কবির অন্যান্য কাব্যসমূহ

কাব্য - অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলন চাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশি (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), সিন্ধু হিল্লোল (১৯২৮), সঞ্চিতা (১৯২৮), সন্ধ্যা (১৯২৯), প্রলয়শিখা (১৯৩০), নজরুল স্বরলিপি (১৯৩১), সুরলিপি (১৯৩৪), নজরুল গীতিশ (১৯৩০), গানেরমালা (১৯৩৪), মরুভাস্কর (১৯৫১), ধূমকেতু (১৯৬২) ইত্যাদি। **নাটক** - ঝিলিমিলি (১৯৩০), আলেয়া (১৯৩৮), পুতুলের বিয়ে (১৯৩৪) ইত্যাদি। **প্রবন্ধ** - যুগবানী (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রা (১৯২৬), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৭) ইত্যাদি। **উপন্যাস ও ছোটোগল্প** - ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১), শিউলিমালা (১৯৩১) ইত্যাদি।

সাররংক্ষেপ

সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী কবি 'নারী' কবিতায় সাম্যের গান গাইতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর চোখে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। এই পৃথিবীতে যা কিছু মহান, যা কিছু চিরকল্যাণকর তার সমস্ত কিছুতেই নারী পুরুষের সমান কৃতিত্ব। সমগ্র বিশ্বে যত পাপ তাপ, বেদনা, অশ্রু সমস্ত কিছুই অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী এনেছে। যারা

নারীদের নরককুন্ড বলে হেয় জ্ঞান করে তারা জানে না আদি পাপের উত্তরাধিকার নারী নয়, পুরুষই। অথচ পাপ, শয়তান এরা না নারী না পুরুষ, এরা ক্লীব। সেজন্য তারা নারী পুরুষের মাঝে সমানভাবে বিরাজমান। বিশ্বে যত ফুল, ফল আছে তাতে রূপ-রস-গন্ধ নারীই দান করেছে।

প্রেমের স্মৃতিসৌধ তাজমহলের অন্তরে নারী মমতাজ এবং বাইরে পুরুষ তথা মোঘল সম্রাট সাজাহান বিরাজমান। জ্ঞানে, গানে, শস্যে-সুষমায় নারী-লক্ষ্মী নানারূপে বিরাজিতা।

নারীর বিরহ মিলনে নরের হৃদয়ে জেগেছে কবি প্রাণ অর্থাৎ কাব্য কবিতা, শব্দ, গানের জগৎ পেয়েছেন কবি। জগতে মহামানবের জন্মের মূলেও নারী। এই বিশ্বে বড়ো বড়ো অভিযানের পেছনে রয়েছে মা বোনদের মহান ত্যাগ ও অনুপ্রেরণা অথচ সকল অভিযানে কৃতিত্ব পেয়েছে পুরুষ। হৃদয়হীন পুরুষদের হৃদয়বান করে তুলতে নারী তার অর্ধেক হৃদয় দান করেছে। কবির উপলব্ধি বিলাসী পিতা রামচন্দ্র লবকুশকে পরিত্যাগ করেছেন, আর জননী সীতা লালন পালন করেছেন। পিতার আদেশে নর অবতার পরশুরাম কুঠারের আঘাতে মাতৃহত্যা করেছে।

অর্ধনারীশ্বর আজ পাশ ফিরে শুয়েছেন, বহুকাল নারী চাপা পড়েছিল এখন চাপা পড়েছে পুরুষ। আজ সাম্যের যুগ, এখনও যদি পুরুষেরা নারীদের বন্দি করে রাখতে চায় তাহলে আগামী যুগে নিজেদের রচিত কারাগারে নিজেরাই ভুগে মরবে, কবি দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন -

"যুগের ধর্ম এই -

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!"

কবির মতে নারীকে দাসীর চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে এবার বেরিয়ে আসতে হবে যমপুরী ভেঙে পাতাল ফুঁড়ে ওঠা নাগিনীর মতো। তাই সমাজ সচেতন কবি নজরুল নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার ও অবিচারের উচ্ছেদ সাধনে যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও নারীর সমমর্যাদা দাবি করেছেন - কারণ কবি দৃঢ় বিশ্বাস-

' সেদিন সুদূর নয় -

যে দিন ধরণি পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!'

শব্দার্থ

চক্ষে = চোখে, রোপিয়া = রোপন করিয়া, ভেদাভেদ = পার্থক্য, বহ = বহন করা, মহান = মহৎ, রমণী = নারী, নর = পুরুষ, বিশ্ব = পৃথিবী, বেদনা = যন্ত্রনা, কল্যাণকর = মঙ্গলময়, নরককুন্ড = যাতনাময় স্থান বিশেষ, পাপ = অনিষ্ট, তোমা = তোমরা, অশ্রুবারি = চোখের জল, তারে = তাকে, বলিয়া = বলে, নহে = নয়, হেয় = তুচ্ছ, মিলিয়া = মিলে, আদি পাপ = প্রথম অনিষ্ঠ, ফলিয়াছে = উৎপন্ন হয়েছে, শয়তান = দুষ্ট, সুনির্মল = অতীব পবিত্র, ক্লীব = কাপুরুষ / অক্ষম, সাজাহান = পঞ্চম মোঘল সম্রাট, রহে = রয়, থাকে; সুষমা = লাবণ্য, তাহে = তাকে, দিবসের = দিনের, তপ্ত = উত্তপ্ত, প্রচন্ড গরম; তাজমহল = সাজাহান নির্মিত মমতাজের স্মৃতি সৌধ, কামিনী = স্ত্রী, লক্ষ্মী = সম্পদ, সমীরণ = বাতাস, সঞ্চারি = সঞ্চালন করে, দিবসে = দিনে, জ্বালা = যন্ত্রনা, নিশিথ = রাত্রি, রৌদ্রদাহ = রৌদ্রোত্তাপ, মরুতৃষ্ণা = মরুভূমির ন্যায় তৃষ্ণা, যামিনী = রাত্রি, উর্বর = সর্ব শস্যোৎপাদক, বারিবাহ = বৃষ্টির প্রবাহ, শক্তি = জোর, সাম্যের = সমতার, দীপ্ত = উজ্জ্বল, কল্যাণকর = মঙ্গলকারী, রৌদ্রদাহ = সূর্যালোকের তাপ, কামিনী = নারী, রমনী; অর্ধনারীশ্বর = একদেহে হরগৌরীর মিলিত রূপ, যামিনী = রাত্রি, ডঙ্কা = জয়ঢাক, সমীরণ = বায়ু, ব্যাকুলতা = আবেগময়তা, রোপিয়া = বপন করে, গিরিদরী = পর্বত-গুহা, পরশ = স্পর্শ, অমৃত = সুধা, খুন = রক্ত, ধরায় = জগতে, দরদে = মমতায়, বধূ = ঘরনি, শস্যক্ষেত্র = ফসলের ক্ষেত, হল = লাঙল, বাহ = বাহক।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো : মান–১

১. 'নারী' কবিতায় 'বিশ্বের সমস্ত মহান সৃষ্টির কারিগর' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর - 'নারী' কবিতায় 'বিশ্বের সমস্ত মহান সৃষ্টির কারিগর' বলতে সমানভাবে নারী ও পুরুষকে বোঝানো হয়েছে।

২. "অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী?" - কী অর্ধেক আনার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর - বিশ্বের সমস্ত সহায় ও চিরকল্যাণ দিকগুলো নারী-পুরুষের সম্মিলিত অবদান।

৩. কী বলে নারীকে হেয়-জ্ঞান করা হয়?

উত্তর - নারীকে 'নরককুন্ড' বলে হেয়-জ্ঞান করা হয়।

৪. 'নারী দিল তাহে' -নারী কোথায় এবং কী দিল?

উত্তর - এ পৃথিবীতে যত ফুল ফুটেছে এবং ফল ফলেছে, তাতে নারী রূপ, রস মধু ও সুন্দর গন্ধ জুগিয়েছে।

৫. "দেখিয়াছ তার প্রাণ" - কার প্রাণ দেখার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন কবি?

উত্তর - কবি তাজমহলের পাথর এবং তার প্রাণকে দেখার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন।

৬. কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারীকে কীসের লক্ষ্মী বলে প্রতিপন্ন করেছেন?

উত্তর - কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারীকে জ্ঞানের, গানের, শস্যের লক্ষ্মী বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

৭. এ জগতে পুরুষ কী এনেছে বলে কবি জানিয়েছেন?

উত্তর - এ জগতে পুরুষ দিবসের জ্বালা, তথা রোদের উত্তপ্ত দাবদাহ এনেছে বলে জানিয়েছেন।

৮. শস্যক্ষেত্র উর্বর কীভাবে হয়েছে?

উত্তর - শস্যক্ষেত্র উর্বর হয়েছে পুরুষের দ্বারা হালচাষের মাধ্যমে।

৯. উর্বর শস্যক্ষেত্রে নারীরা কী করেছে?

উত্তর - উর্বর শস্যক্ষেত্রে নারীরা শস্য রোপন করে শস্যশ্যামলা করেছে।

১০. 'নর পেল কবি প্রাণ' - নর 'কবি-প্রাণ' কীভাবে পেল?

উত্তর - নারীর বিরহ ও মিলনের দ্বারা কবি-প্রাণ পেল।

১১. জগতের বড়ো বড়ো জয় ও অভিযান কীভাবে মহীয়ান হয়েছে?

উত্তর - জগতের বড়ো বড়ো জয় ও অভিযান মাতা, ভগিনী ও বধূদের ত্যাগে মহীয়ান হয়েছে।

১২. কোনো কালে কে একা জয়ী হয়নি বলে কবি জানিয়েছেন?

উত্তর - কবি জানিয়েছেন, কোনো কালে পুরুষের তরবারি একা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হয়নি।

১৩. রাজাকে কে শাসন করেছে?

উত্তর - রাজাকে রানি শাসন করেছে।

১৪. পুরুষকে মানুষ করতে নারী কি দিল?

উত্তর - পুরুষকে মানুষ করতে নারী অর্ধেক হৃদয় ঋণস্বরূপ দান করল।

১৫. নর অবতার রূপে পুরুষ কী করল?

উত্তর - নর অবতার রূপে পুরুষ পিতার আদেশে জননীকে কুঠারের আঘাতে ছিন্ন করল।

১৬. পাশে ফিরে আজ কে শুয়ে আছেন?

উত্তর - পাশে ফিরে আজ অর্ধনারীশ্বর শুয়ে আছেন।

১৭. "শোনো মর্ত্যের জীব" - কবি মর্ত্যের জীবকে কী শুনতে বলেছেন?

উত্তর - কবি মর্ত্যের জীবকে শুনতে বলেছেন যে, অপরকে সে যত পীড়ন করবে, নিজে ততটা ক্লীবে পরিণত হবে।

১৮. 'মরণের পরে' - মরণের পরে কী নামল?

উত্তর - মরণের পরে ধরায় বিভাবরী নামল।

১৯. 'ভেঙে ফেলো ও শিকল' - কোন্ শিকল ভেঙে ফেলার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর - নারীর হাতের রুলি, পায়ের মল, মাথার ঘোমটা-সহ সমস্ত আবরণ, যা তাকে ভীরু করেছে, সেগুলিকেই শিকল বলা হয়েছে এবং তা ভেঙে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

২০. 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর' - 'কল্যাণকর' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর - 'কল্যাণকর' শব্দের অর্থ হল - মঙ্গলময় বা হিতকর।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **মান -১**

১. 'নারী' কবিতাটি কে রচনা করেন?

উত্তর -

২. 'নারী' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর -

৩. 'নারী' কবিতাটি কত সালে কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর -

৪. 'নারী' কবিতাটি কোন্ পর্যায়ের কবিতা?

উত্তর -

৫. কাজী নজরুল ইসলাম কী ধরনের 'গান' করেন বলে জানিয়েছেন?

উত্তর -

৬. 'সাম্যের গান গাই' - 'সাম্যের গান গাই' বলতে কবি এখানে কী বুঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর -

৭. কবির চোখে কীসের ভেদাভেদ নেই?

উত্তর -

৮. "আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।" - 'আমার' বলতে কবি এখানে কাকে বুঝিয়েছেন?

উত্তর -

৯. বিশ্বের সমস্ত মহান সৃষ্টির কারিগর কারা?

উত্তর -

১০. 'নরককুন্ড' কী?

উত্তর -

১১. "আদি পাপ নারী নহে" - আদি পাপের অধিকারী কে?

উত্তর -

১২. কবির মতে আদি-পাপ প্রকৃতপক্ষে কী?

উত্তর -

১৩. 'নারী দিল তাহে' - নারীর কোথায় কী দানের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর -

১৪. এ বিশ্বে যত ফুল ফুটেছে, ফল ফলেছে, তাতে নারীর অবদান কি?

উত্তর -

১৫. তাজমহলের ভেতরে এবং বাইরে কে কে বিরাজমান?

উত্তর -

১৬. দিবসে নারী কী দিয়েছে?

উত্তর -

১৭. 'মরুতৃষা' নিয়ে কে এসেছে?

উত্তর -

১৮. 'স্বর্ণ-রৌপ্যভার' - কীসের স্পর্শে স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কার হয়েছে?

উত্তর -

১৯. 'নর পেল কবি প্রাণ' - নর কীসে 'কবিপ্রাণ' পেল?

উত্তর -

২০. নারী কী দিল?

উত্তর -

২১. ইতিহাসে কী লেখা আছে?

উত্তর -

২২. সন্তানহারা মাতৃ-হৃদয়ের হাহাকার আর বোনদের সেবার কথা কোথায় লেখা নেই?

উত্তর -

২৩. 'বিজয়-লক্ষ্মী নারী' পুরুষকে কী দিয়েছে?

উত্তর -

২৪. নারী দীপ্ত নয়নে কী পরাল?

উত্তর -

২৫. 'পিতার আদেশে জননীরে' - পিতা এবং জননী কে কে?

উত্তর -

২৬. 'সে যুগ হয়েছে বাসি' - কোন্ যুগের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর -

২৭. 'যুগের ধর্ম এই' - যুগের ধর্ম কী?

উত্তর -

২৮. 'সেদিন সুদূর নয়' - কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর -

২৯. 'ওড়াও সে আবরণ' - এখানে কাকে কী আবরণ ওড়াবার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর -

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ **মান - ৩**

১. "অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী!" - তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৩

উত্তর - আলোচ্যমান অংশটি সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'নারী' কবিতার অংশ বিশেষ।

আলোচ্য কবিতায় কবি নজরুল উপলব্ধি করেছেন, এ জগতে যত চিন্তা কল্যাণকর মহান সৃষ্টি রয়েছে, তা পুরুষ এবং নারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টারই ফসল। সমাজেই নারী নির্মম লাঞ্ছনা, নির্যাতন, অত্যাচার ও অবরোধ প্রথার শিকার। কিন্তু কবির জীবনদর্শনে নারী-পুরুষে কোনো প্রভেদ নাই। কবির দৃঢ় বিশ্বাস - বিশ্বে আজ পর্যন্ত যা কিছু মহান সৃষ্টি, যা কিছু কল্যাণকর, সেখানে শুধু একা পুরুষের নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের সমান ভূমিকা রয়েছে। তাই কবি চির-কল্যাণকর মহান সৃষ্টিকর্মে নারী-পুরুষ উভয়কে সম মর্যাদা দিয়েছেন।

নিজে করো ঃ (মান - ৩)

২. "অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান!"
- উদ্ধৃতিটির পশ্চাদ্‌পটে যে কাহিনি রয়েছে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৩
উত্তর ঃ

৩. "জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী।"- উদ্ধৃতিটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। ৩
উত্তর ঃ

৪. "দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস নিশীথে হয়েছে বধূ" - এরূপ মন্তব্যের কারণ কী? ৩
উত্তর ঃ

৫. "নারীর বিরহে নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার, হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।"- উদ্ধৃতিটি মূল বক্তব্য পরিষ্ফূট করো।৩
উত্তর ঃ

৬. "- সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।"- উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৩
উত্তর ঃ

৭. "কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে!"
- কার কোন্ কবিতায় অংশ? উদ্ধৃতাংশটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করো। ১+২
উত্তর ঃ

৮. 'যুগের ধর্ম এই' - যুগের ধর্ম উল্লেখ করো। ৩
উত্তর ঃ

৯. "দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন" - কার প্রতি কবির এই আহ্বান? কেন? ১+২
উত্তর ঃ

১০. "সে-দিন সুদূর নয়"
- কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? ১+২
উত্তর ঃ

১১. "সে যুগ হয়েছে বাসি"
- কোন্ যুগের কথা এখানে বলা হয়েছে? বর্তমানে নারীর ভূমিকা কী? ১+২
উত্তর ঃ

১২. 'পুরুষ হৃদয় হীন' - কোন্ কবিতার অংশ? এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২

উত্তর ঃ

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ **মান - ৫**

১. "সেদিন সুদূর নয় -

যে-দিন ধরণি পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!"

- কে অন্তরে এই প্রত্যাশা পোষণ করেছেন? 'সে-দিন' বলতে এখানে কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে? উদ্ধৃতাংশটির মর্মার্থ উপস্থাপন করো। ১+২+২=৫

উত্তর - সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'সাম্যবাদী' পর্যায়ের অন্তর্গত 'নারী' কবিতায় কবি অন্তরে আলোচ্য প্রত্যাশা পোষণ করেছেন।

আলোচ্য কবিতায় কবি 'সে দিন' বলতে বুঝিয়েছেন, যে দিন নারী, পুরুষের সমান মর্যাদা পাবে, যে দিন ধরণী পুরুষের সাথে নারীরও জয়গান গাইবে অর্থাৎ যে দিন ঘোমটার আড়ালে হাতে রুলি, পায়ে মলের শিকল ছিন্ন করে, দাসীর চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে নারী বেরিয়ে আসবে যমপুরী ভেঙে পাতাল ফুঁড়ে ওঠা নাগিনির মতো। এতোদিন নারী যে হাতে অমৃত বিলিয়েছে, প্রয়োজনে সে হাতে কূট বিষ বিলিয়ে দেবে। তাই কবি চেয়েছেন আজকের নারীসমাজ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে স্ব-মহিমায় জেগে উঠুক।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী। কবি উপলব্ধি করেছেন জগৎ-কল্যাণকর মহান সৃষ্টির মূল রহস্য। কবির জীবন দর্শনে নারী পুরুষের কোনো প্রভেদ নেই। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস - বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি, যা-কিছু কল্যাণময় ও মঙ্গলকর, সেখানে শুধু একা পুরুষের নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই সমানভাবে বিরাজিত। তাই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় -

'সে-দিন সুদূর নয় -

যে-দিন ধরণি পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!'

নিজে করো ঃ **(মান-৫)**

২. "সাম্যের গান গাই"

- কে সাম্যের গান গাইছেন? কোথায় গেয়েছেন? কোন্ পরিস্থিতি দেখে তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন? ১+১+৩ = ৫

উত্তর -

৩. 'নারী' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর ঃ

৪. কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'নারী' কবিতাটিতে অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর শোনা যায় - আলোচনা করো। ৫

উত্তর ঃ

৫. "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

- উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে? কোন্ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতাংশটির অবতারণা করা হয়েছে? উদ্ধৃতাংশটির মূল বক্তব্য লেখো। ১+২+২=৫

উত্তর ঃ

৬. 'নারী' কবিতায় কবির চিন্তায় পুরুষদের সাফল্যের পিছনে যে নারীজাতিরও অবদান কম নয়, কবিতাটি অবলম্বনে তা আলোচনা করো। ৫

উত্তর ঃ

৭. নজরুল ইসলামের লেখা 'নারী' কবিতায় যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রকাশ ঘটেছে, তা আলোচনা করো। ৫

উত্তর ঃ

৮. "পুরুষ হৃদয়হীন"

- কে, কোথায় এই মন্তব্য করেছেন? কেন তিনি এমন মন্তব্য করেছেন? ১+৪=৫

উত্তর ঃ

*****

একক – ১ (কবিতা)

যুদ্ধ কেন ?

দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫)

কবি পরিচিতি

কবি দিনেশ দাস ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার আলিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হৃষীকেশ দাস, সরকারি কর্মচারী, মাতা কাত্যায়নী দেবী। দিনেশ দাস পিতা মাতার একমাত্র সন্তান হওয়াতে কবির শৈশব ও বালক বয়স আদর যত্নের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে চেতলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ এবং ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে গৃহশিক্ষকতা থেকে শুরু করে চা-বাগান, বীমা অফিস, পত্রিকা সম্পাদনা নানা জীবিকার পর হাওড়া জেলার দেউলাপুরে প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব নেন। এরপর কলকাতায় এসে চেতলা বয়েজ স্কুলের শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শেষ করেন। এর সাথে সাথে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলে যুক্ত ছিলেন তিনি। এছাড়া চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালনা ও গীতিকার রূপেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছাত্রাবস্থাতেই কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিঃ কবি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কাস্তে' রচনা করেন। কিন্তু রাজরোষে পড়ার ভয়ে কেউই বইটি ছাপাতে রাজি হল না। পরে ১৯৩৮ খ্রিঃ শারদীয়া 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় হঠাৎ এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতা প্রকাশনার সাথে সাথে গুণীমহলে সাড়া পড়ে যায় এবং পরবর্তীতে তিনি 'কাস্তে কবি' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কবির প্রথম কবিতা 'শ্রাবনে' (১৯৪১) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা' (১৯৪২) প্রকাশ পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। কাস্তে কবি দিনেশ দাসের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল ঃ- 'কবিতা' (১৯৪২), 'ভুখা মিছিল' (১৯৪৪), 'দিনেশ দাসের কবিতা' (১৯৫১), 'অহল্যা' (১৯৫৪), কাঁচের মানুষ (১৯৬৩), 'অসংগতি' (১৯৭২), 'কাস্তে' (১৯৭৫) 'রাম গেছে বনবাসে' (১৯৮২) ইত্যাদি।

'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থ কবিকে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও অনেক ধরনের পুরস্কার এনে দিয়েছে। 'অসঙ্গতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নজরুল পুরস্কার (১৯৮১) লাভ করেন। 'রাম গেছে বনবাসে' কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮৩) পান। এমন মহান প্রতিভাবান কবি ১৯৮৫ খ্রিঃ ১৩ই মার্চ পরলোকগমন করেন।

উৎস

'যুদ্ধ কেন?' কবিতাটি কবি দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয় ১৯৩৭ খ্রিঃ এবং মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ খ্রিঃ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা কবিতাটি কবির যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদমূলক কবিতা।

সারসংক্ষেপ

'যুদ্ধ কেন?' কবিতায় কবি নিজের তথা বিশ্বের সচেতন মানুষদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন, যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কিনা এই বিষয়ে। তাই কবিতার প্রথমদিকের কবি যুদ্ধবাজ আহাম্মকদের বর্বর যুদ্ধলিপ্সার প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। আর শেষদিকে উদ্যমী মানুষদের পরামর্শ দিয়েছেন বিপরীত অভিমুখী চেষ্টা করার জন্য। পৃথিবী অনেক বড়ো। সেখানে মাত্র কয়েক কোটি মানুষ বসবাস করে। এখনও অনেক খালি জায়গা পড়ে আছে। তবুও মানুষের মন থেকে লোভ যায়না। তারা আরও বেশি জায়গার জন্যে বোকা নির্বোধের মত যুদ্ধ করে।

কবি বলেছেন, আকাশজুড়ে মহাযুদ্ধের মহামারি। কারণ একটু জায়গার জন্য এই পৃথিবীতে যুদ্ধের মড়ক বা মহামারি দেখা দেয়। এই যুদ্ধে জয়ী এবং পরাজিত দুই পক্ষই মানুষ। তাই এই মারণযুদ্ধের কোন অর্থ নেই কবির কাছে। তাঁর একটাই প্রশ্ন - কেন বারবার এই যুদ্ধের সম্মুখীন হয় মানুষ? আহাম্মকদের কুটিল লোভের বশে এই পৃথিবী বার বার পিষ্ঠ হয় ট্যাঙ্কারের চাকায়।

পরিশেষে, এমন একটি পরিস্থিতিতে কবি ধ্বংসাত্মক কাজ ছেড়ে সৃষ্টিশীল গঠনমূলক কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। কবির মতে, পৃথিবী বিশাল। সেখানে আছে পর্যাপ্ত জলাভূমি, বনভূমি। শুধু প্রয়োজনে, জলা ভূমিকে মাঠ করতে হবে

এবং জঙ্গলকে পরিষ্কার করে বসবাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। মেরু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে হবে। কিরঘিজ স্টেপিসে বীজ বপন করে শস্য উৎপাদন করতে হবে। বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীল, মঙ্গলময় ও উন্নয়নমুখী দিকটি সবার সামনে তুলে ধরতে হবে।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

আহাম্মক = নির্বোধ, বোকা; বর্বর = অসভ্য, স্থান = জায়গা, ক্রুর = হিংস্র, হাওয়াই = এক প্রকার আতশবাজি, আকাঙ্ক্ষায় = ইচ্ছায়, মহাসমর = মহাযুদ্ধ, চিড় = ফাটল, মহামারি = মড়ক, ফাটারেকর্ড = অচল জিনিস, চরমতম = চূড়ান্ত, একঘেয়ে = একনাগাড়ে, ফাটল = ফাঁকা, চিড়; জলাভূমি = জলযুক্ত জমি, হাঁসিল = দখল, ভেঙ্গেচুরে = খন্ড বিখন্ড করে, পিষে = চুর্ণিত করে, অভিনয় = নাটক, ট্যাংক = এক প্রকার যুদ্ধযান, হঠাৎ = আচমকা, বারেবারে = বারবার, প্যারাস্যুট = বিমান থেকে মাটিতে নামার যন্ত্র, মেরু = পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণের শেষ প্রান্ত, বসতি = বসবাসের জায়গা, বীজ = শস্যদানা, কিরঘিজ = মধ্যএশিয়ার দুর্গম জনপদ, স্টেপিস = ইউরোপের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল, বিজ্ঞানের তাপ = বিজ্ঞানের উত্তাপ, আলো = জ্যোতি, কিরণ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো : মান - ১

১. 'যুদ্ধ কেন'? কবিতাটির কবি কে?

উত্তর ঃ- 'যুদ্ধ কেন'? কবিতার কবি দিনেশ দাস।

২. 'যুদ্ধ কেন?' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উত্তর ঃ-'যুদ্ধ কেন?' কবিতাটি 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৩. কবির মতে পৃথিবীতে কত লোক আছে?

উত্তর ঃ- কবির মতে পৃথিবীতে কয়েক কোটি লোক আছে।

৪. কবি যুদ্ধের কারণ স্বরূপ কী মনে করেন?

উত্তর ঃ- কবি মনে করেন যে, মানুষের বাসস্থানের অভাবের জন্যই যুদ্ধ হয়।

৫. 'তবুও লড়াই করে' - কারা লড়াই করে?

উত্তর ঃ-আহাম্মক লোকেরা লড়াই করে।

৬. যুদ্ধ বাঁধলে কী হয়?

উত্তর ঃ- যুদ্ধ বাঁধলে বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর হাওয়াই উড়তে থাকে।

৭. আজকে আকাশজুড়ে কীসের মহামারি?

উত্তর ঃ- আজকে আকাশজুড়ে মহাসমরের মহামারি।

৮. 'মহামারি' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ-'মহামারি' বলতে মড়ককে বোঝায়।

৯. 'একথা চরমতম নয়' - কোন্ কথা চরমতম নয়?

উত্তর ঃ- যুদ্ধে হারি কিংবা জিতি কবির মতে একথা চরমতম নয়।

১০. 'কেন হবে এই বর্বর অভিনয়' - এই প্রশ্ন কার?

উত্তর ঃ- 'যুদ্ধ কেন?' কবিতায় কবি দিনেশ দাস এই প্রশ্ন করেছেন।

১১. 'কেন হবে এই বর্বর অভিনয়' - এখানে কোন্ অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ- এখানে যুদ্ধের অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে।

১২. 'যুদ্ধ কেন?' কবিতায় কবি কোন্ যুদ্ধের ইঙ্গিত করেছেন?

উত্তর ঃ- 'যুদ্ধ কেন'? কবিতার কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত করেছেন।

১৩. 'আহাম্মকের ক্রুর আকাঙ্ক্ষা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ- 'আহাম্মকের ক্রুর আকাঙ্ক্ষা' বলতে আহাম্মকদের যুদ্ধ অভিলাষ বা বাসনাকে বোঝানো হয়েছে।

১৪. এ পৃথিবী বারবার কোথায় চিড় খায়?

উত্তর ঃ- এ পৃথিবী বারবার ট্যাঙ্কের চাকায় চিড় খায়।

১৫. ট্যাঙ্ক কি?

উত্তর ঃ- ট্যাঙ্ক হল একপ্রকার যুদ্ধযান বা যুদ্ধে ব্যবহৃত একপ্রকার কামান বহনের গাড়ি।

১৬. কবির মতে পৃথিবী কীসের মতো ঘুরে চলে?

উত্তর ঃ-কবির মতে পৃথিবী ফাটা রেকর্ডের মতো ঘুরে চলে।

নিজে করো ঃ (মান - ১)

১৭. কবির গানের পিন কোথায় বেঁধে গেছে?

উত্তর ঃ-

১৮. 'গানের পিন ফাটলে বেঁধে যাওয়ার ফল কী?

উত্তর ঃ-

১৯. কবি জায়গার অভাব পূরণের জন্য কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন?
উত্তর ঃ-

২০. কোথায় বসতি স্থাপনের আবেদন জানিয়েছেন কবি?
উত্তর ঃ-

২১. মেরুতে কীভাবে যেতে বলা হয়েছে?
উত্তর ঃ-

২২. কবি কোথায় বীজ বোনার পরামর্শ দিয়েছেন?
উত্তর ঃ-

২৩. কিরঘিজ স্টেপিস কী?
উত্তর ঃ-

২৪. 'যুদ্ধ কেন?' কবিতায় কোন্ জিনিসটিকে কবি তুলে ধরতে চেয়েছেন?
উত্তর ঃ-

২৫. বিজ্ঞানের কোন্ জিনিসটি কবি চান না?
উত্তর ঃ-

২৬. 'মহাসমরের মহামারি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর ঃ-

২৭. 'যুদ্ধ কেন?' কবিতায় কবি কাদের আহাম্মক বলেছেন?

উত্তর ঃ-

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ **মান - ৩**

১. 'একথা চরমতম নয়' - কোন্ কথা, কেন চরমতম নয়?

উত্তর ঃ আলোচ্য পঙক্তিটি কাস্তে কবি দিনেশ দাসের 'যুদ্ধ কেন?' কবিতার অংশ।

যুদ্ধে কারও জয়ী হওয়া বা পরাজিত হওয়া কথাটি যে চরমতম নয়, তা আলোচনা প্রসঙ্গে কবি আলোচ্য অংশটির অবতারণা করেছেন। যুদ্ধ সবসময় ধ্বংসকেই ডেকে আনে। যুদ্ধের ফলে মৃত্যু হয় মানুষের। পৃথিবীতে আকাল, মহামারির দেখা দেয়। তাই কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেই যুদ্ধ বিষয়টি কাম্য নয়। কিন্তু কিছু যুদ্ধবাজ আহাম্মকেরা নিজেদের লোভের জন্য, আত্মস্বার্থের জন্য অকারণ যুদ্ধ বাধায়। সাধারণ মানুষদের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির চিন্তা করেনা। এই নেতিবাচক মানব প্রবৃত্তির অবসান একান্ত আবশ্যক বলে কবি মনে করেন। তাই কবি বলেছেন -

'এই যুদ্ধে আমরা জিতি কিংবা হারি
একথা চরমতম নয়।'

২. 'তবুও লড়াই করে যত আহাম্মক' - কবি কাদের আহাম্মক বলেছেন? আহাম্মকরা কী কারণে লড়াই করে?

উত্তর ঃ কবি দিনেশ দাস তাঁর 'যুদ্ধ কেন?' কবিতায় বিশ্বের সমস্ত যুদ্ধবাজদের 'আহাম্মক' বলেছেন। তারা যুদ্ধোন্মত্ত ও স্বার্থমগ্ন হয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করে এবং পরোক্ষভাবে যুদ্ধে মদত জোগায়।

যুদ্ধবাজ মানুষেরা অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপরায়ণ। আমাদের এই পৃথিবীতে স্থান অনেক বড়ো। তবুও যুদ্ধবাজ লোভী মানুষেরা নিজস্বার্থ রক্ষার জন্য উন্মত্ত হয়ে যুদ্ধ করে। পৃথিবীর অনেকটা অংশ তারা নিজেদের দখলে আনতে চায়। তাদের এই লোভ বা স্বার্থান্ধতার কারণের অভাব নেই, শুধুমাত্র ক্ষমতার বশবর্তী হয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য লড়াই করে মানুষের অমূল্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। তাই কবি এইসব যুদ্ধবাজ মানুষদের আহাম্মক বলে অভিহিত করেছেন।

নিজে করো ঃ মান - ৩

৩. 'কেন হবে বারবার বর্বর এই অভিনয়'?- উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা? কেন এই কথা বলা হয়েছে?
উত্তর ঃ

৪. "এই যুদ্ধে আমরা আজ জিতি কিংবা হারি' - উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো?
উত্তর ঃ

৫. 'আজকে আমার প্রশ্ন' - কার লেখা, কোন্ কবিতাংশ থেকে নেওয়া? তিনি কোন্ প্রশ্ন করেছেন?
উত্তর ঃ

৬. 'এ পৃথিবী বারবার চিড় খায় ট্যাংকের চাকায়' - কোন্ কবিতার অংশ? পৃথিবী বারবার চিড় খাওয়ার কারণ কী?
উত্তর ঃ

৮. 'আমার গানের পিন বেধে গেছে হঠাৎ ফাটলে' - 'গানের পিন' বলতে কী বুঝ? পংক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো?
উত্তর ঃ

৯. 'বারেবারে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে এক কথা কয়' - কে এক কথা কয়? কথাটিই বা কী?
উত্তর ঃ

৩. "বিজ্ঞানের তাপ নয়, আলো তুলে ধরো"
- কার কোন্ কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে? এরূপ উক্তির কারণ কী?
উত্তর ঃ

যুদ্ধ কেন

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ **মান - ৫**

১. 'বিজ্ঞানের তাপ নয় - আলো তুলে ধরো'
- কবি ও কবিতার নাম লেখো। কবি বিজ্ঞানের তাপ ও আলো বলতে কী বুঝিয়েছেন? কবি কেন তাপ নয়, আলো তুলে ধরার কথা বলেছেন? ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ কবি দিনেশ দাস তাঁর 'যুদ্ধ কেন?' কবিতায় উদ্ধৃতাংশে 'বিজ্ঞানের তাপ' বলতে

বিজ্ঞানের ক্ষতিকর দিক তথা অভিশাপ এবং 'বিজ্ঞানের আলো' বলতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদী দিকটি বা মঙ্গলময় রূপটিকে বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কবি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের যে আগ্রাসী মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন তারই ফলস্বরূপ এই কবিতার অবতারণা। এখানে কবি বিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান নিরপেক্ষ হলেও, বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মানুষ অসৎ কাজে ব্যবহার করে থাকে। তখন বিজ্ঞান কল্যাণময়ী থেকে হয়ে উঠে ধ্বংসাত্মক। যার দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় - জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের কারণে বহু মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে। তাই বিজ্ঞানের এই ধ্বংসকারী রূপকে বর্জন করে কবি বিজ্ঞানকে তুলে ধরতে চান কল্যাণময়ী ও মানবসেবায় আলোকরূপে ব্রতী করান - বিজ্ঞানের সেই আলোই একমাত্র পারবে যুদ্ধ ও মৃত্যুর অন্ধকার থেকে পৃথিবীকে ও পৃথিবীর মানুষকে মানবতার জ্যোতির্ময় লোকে নিয়ে যেতে।

নিজে করো ঃ

২. 'এ পৃথিবী বারবার চিড় খায় ট্যাংকের চাকায়' - 'চিড়' শব্দের অর্থ কী? পৃথিবীর চিড় খাওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে? অংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো? ১+২+২=৫

উত্তর ঃ

৩. 'যুদ্ধ বাধে আর ওড়ে মৃত্যুর হাওয়াই' - কার লেখা, কোন্ কবিতার পংক্তি? যুদ্ধ বাধে কেন? যুদ্ধের পরিণাম কী? ১+২+২=৫

উত্তর ঃ

৪. 'কেন হবে বারবার বর্বর এই অভিনয়?' - কোন্ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটি করা হয়েছে? কোন্ অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে? এই অভিনয়কে 'বর্বর' বলা হয়েছে কেন? ১+২+২ = ৫

উত্তর ঃ

৫. 'পৃথিবী অনেক বড়ো/ জলাভূমি মাঠ করো' - কার, কোন্ কবিতার পংক্তি? কোন্ প্রেক্ষিতে কবি কথাটি বলেছেন? কবির এই প্রত্যাশার কারণ কী? ১+২+২ = ৫

উত্তর ঃ

৬. 'যুদ্ধ কেন' কবিতায় কবি যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তা আলোচনা করো। ৫

উত্তর ঃ

৭. 'যুদ্ধ কেন?' কবিতার নামকরণের সার্থকতা লেখো। ৫

উত্তর ঃ

*****

একক – ১ (কবিতা)

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি পরিচিতি (১৯২৬ - ১৯৪৭)

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ও মানবতাবাদী, সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে ৪২ মহিম হালদার স্ট্রিটে অবস্থিত তাঁর মাতুলালয় সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে। তিনি একুশ বছরের জীবনে কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। পিতা নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, মা সুনীতি দেবী। স্বল্পায়ু জীবনে সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের স্বপক্ষে কবিতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের গৌরবে, অল্প বয়সেই ভাষা ও ছন্দের দক্ষতায়, রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি বলিষ্ঠ বিশ্বাসে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা কাব্যজগতে এক বিশিষ্ট নাম। পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় অত্যাচার ও জাপানি আক্রমণ, কালোবাজারি, মজুতদারী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর সাহিত্যে সেই বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল - 'পূর্বাভাস' (১৯৫০), 'ঘুমনেই' (১৯৫০), 'মিঠেকড়া' (১৯৫১), 'অভিযান' (১৯৫৩), 'হরতাল' (১৯৬২), 'গীতিগুচ্ছ' (১৯৬৫) প্রভৃতি। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় কবির জীবদ্দশায় তাঁর কোনো কাব্যেরই প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি।

রাজনীতিতে থাকাকালীন সময়ে অমানষিক পরিশ্রম ও অনিয়মিত খাওয়াদাওয়ার কারণে তিনি নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৪৭ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

উৎস কাব্যগ্রন্থ

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত সাঁইত্রিশটি কবিতার মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতা হল 'আগামী'।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

আগামী - ভবিষ্যৎ, ভাবী, অনাগত; জড় - চেতনাহীন বস্তু, প্রাণহীন; খনিজ - আকরিক, ভূ-গর্ভস্থিত বস্তু; অঙ্কুরিত বীজ - যার অঙ্কুর বের হয়েছে, ভীরু - ভীতু, সন্দিগ্ধ - সন্দেহপ্রবণ, নগণ্য - তুচ্ছ, গণনার অযোগ্য, মর্মরধ্বনি - গাছের পাতার আওয়াজ, গোপনে - অপ্রকাশ্যে, বিদীর্ণ - ভেদ করা, অরণ্য - বন, আনাগোনা - যাতায়াত, আসা-যাওয়া; উদ্দাম - অত্যন্ত প্রবল, দুর্দমনীয়; তাল - বিশেষ ছন্দ, দৃপ্ত - উদ্ধত, গর্বিত; শাখা - গাছের ডালা, বিস্মিত - চমকিত, সংহত - সুদৃঢ়, দৃঢ়প্রাণ - দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কঠিন প্রত্যয়; প্রত্যাহত - বাধাপ্রাপ্ত, আহ্বানে - ডাকে, মুখরিত - ধ্বনিত, বসন্ত - সর্বশেষ ঋতু, কিশলয় - নতুন কচিপাতা, জয়ধ্বনি - জয়সূচক ধ্বনি, বনস্পতি - বনের পতি, বিশাল গাছ; হানো - আঘাত করো, হাতছানি - হাত নেড়ে ইশারায় ডাকা, পাখির কূজন - পাখির ডাক, পুষ্ট - লালিত পালিত, পরিণত; আপনার জন - আপনজন

সারসংক্ষেপ

'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আগামী' শীর্ষক কবিতায় কবি রূপকের সাহায্য নিয়েছেন। সদ্য অঙ্কুরিত বীজটাকে রূপক করে তিনি মূলত নিজের কথা বলতে চেয়েছেন। সদ্য অঙ্কুরিত বীজকে তিনি মানব শিশুর সাথে তুলনা করে আগামীতে বৃহত্তর সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন কবিতায়। তাই কবিতার শুরুতেই কবিতার বক্তা সদ্য অঙ্কুরিত বীজ সগর্বে তার অস্তিত্বের স্বরূপ ঘোষণা করেছে। অঙ্কুরিত বীজ বলেছে সে জড়, মৃত কিংবা অন্ধকারের খনিজ নয়। সে এক জীবন্ত প্রাণ, সে অঙ্কুরিত বীজ। সে মাটিতে লালিত এক প্রাণ। সে আকাশের ডাকে সন্দিগ্ধ চোখ খুলেছে। অঙ্কুরিত বীজটি ঘোষণা করেছে যে তাকে ঘিরে রয়েছে অনেক স্বপ্ন। অঙ্কুরিত বীজটি জানে, অরণ্যের বিশাল বটবৃক্ষের সমাজে সে নিতান্তই তুচ্ছ, তবুও তার শরীরে যেন গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে। অঙ্কুরিত বীজটি মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং সে আলোর আনাগোনা প্রত্যক্ষ করছে। মাটি বিদীর্ণ করা শিকড়ে সে অরণ্যের বিশাল চেতনাকে অনুভব করেছে। সেজন্য ভাবী অঙ্কুরিত বনস্পতির গভীর আস্থা, আগামী বসন্তেই সে মিশে

যাবে বৃহৎ অরণ্যের সমাজে। আর তার কচিপাতায় জয়ধ্বনি জাগবে। সকলেই যেন তাকে তখন সাদর সম্ভাষণ এবং সংবর্ধনা জানাবে। তাই কবির মতে-

"জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সংবর্ধনা জানাবে সকলে।"

আজ সে (অঙ্কুরিত বীজ) যত ছোটোই হোকনা কেন, সে যেন আগামী দিনের বনস্পতি। তাই অঙ্কুরিত বীজ সদর্পে বলছে - "জানি আমি ভাবী বনস্পতি"। আর বনস্পতিতে পরিণত হওয়ার সম্মতি যেন বৃষ্টি ও মাটির রস থেকে পেয়েছে। সে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছে, যেদিন সে বনস্পতি হবে সেদিন যেন সকলে তার ছায়ায় সমবেত হয়। ভাবী দিনের কথা ভেবে তাই সমাজের কাছে তার আবেদন মানুষ যেন তার ছায়ায় আসে, তাতে যদি কঠিন কুঠারে তাকে আঘাতও করা হয়, তবুও সে সবাইকে হাতছানি দেবে, ফল, ফুল ও পাখির কূজন উপহার দেবে। কারণ সেও যে একই মাটির রসে লালিত ও সকলের আপনজন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১**

১. 'আগামী' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উত্তর ঃ 'আগামী' কবিতাটি 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

২. 'ছাড়পত্র' কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ 'ছাড়পত্র' কাব্যটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. 'আগামী' কবিতাটি প্রথম কবে, কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ 'আগামী' কবিতাটি প্রথম ১৩৫২ বঙ্গাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. 'আগামী' কবিতায় কোন্ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ 'আগামী' কবিতায় বটবৃক্ষের কথা বলা হয়েছে।

৫. 'আগামী' কবিতায় অঙ্কুরিত বীজ আত্মপরিচয় কীভাবে দিয়েছে?

উত্তর ঃ 'আগামী' কবিতায় অঙ্কুরিত বীজ বলেছে সে জীবন্ত প্রাণ, সে এক অঙ্কুরিত বীজ।

৬. "আমি তো জীবন্ত প্রাণ" - 'আমি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ এখানে 'আমি' বলতে নব অঙ্কুরিত এক বনস্পতির বীজকে বোঝানো হয়েছে।

৭. "আমি এক অঙ্কুরিত বীজ" - এখানে কোন্ অঙ্কুরিত বীজের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ এখানে এক ক্ষুদ্র বনস্পতি বা বটবৃক্ষের বীজের কথা বলা হয়েছে।

৮. 'আগামী' কবিতায় অঙ্কুরিত বীজ নিজেকে ভীরু বলেছে কেন?

উত্তর ঃ 'আগামী' কবিতায় সদ্য অঙ্কুরোদগম হওয়া বৃক্ষ শিশু বাস্তব অনভিজ্ঞতার কারণে নিজেকে ভীরু বলেছে।

৯. অঙ্কুরিত বীজকে কী ঘিরে রেখেছে?

উত্তর ঃ অঙ্কুরিত বীজকে স্বপ্ন ঘিরে রেখেছে।

১০. "স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে" -কাকে স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে?

উত্তর ঃ ভাবী বনস্পতি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর সদ্য অঙ্কুরিত বীজকে স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে।

১১. "তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে" - কার শরীরের কথা বলা হয়েছে? 'মর্মরধ্বনি' কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ এখানে নব অঙ্কুরিত, সদ্যোজাত বৃক্ষশিশুর শরীরের কথা বলা হয়েছে।

'মর্মর ধ্বনি' কথার অর্থ হল গাছের পাতার আওয়াজ।

১২. "বিদীর্ণ করেছি মাটি"- বক্তা কীভাবে মাটি বিদীর্ণ করেছে? 'বিদীর্ণ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ বক্তা অর্থাৎ অঙ্কুরিত বীজ মাটির গভীরে শিকড় সঞ্চালনের মাধ্যমে মাটি বিদীর্ণ করেছে। 'বিদীর্ণ' শব্দের অর্থ হল ভেদ করা।

১৩. মাটি বিদীর্ণ করে অঙ্কুরিত বীজ কার আনাগোনা প্রত্যক্ষ করেছে?

উত্তর ঃ মাটি বিদীর্ণ করে অঙ্কুরিত বীজ আলোর আনাগোনা প্রত্যক্ষ করেছে।

১৪. 'আগামী' কবিতাটি কী ধরনের কবিতা?

উত্তর ঃ 'আগামী' কবিতাটি রূপকধর্মী কবিতা।

১৫. 'নেড়ে যাবে মাথা' - বক্তা কীভাবে মাথা নেড়ে যাবে?

উত্তর ঃ উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে বক্তা বৃক্ষ শিশু মাথা নেড়ে যাবে।

নিজে করো ঃ (মান - ১)

১৬. অঙ্কুরিত বীজ তার কোথায় 'অরণ্যের বিশাল চেতনা' অনুভব করে?

উত্তর ঃ

১৭. "..... মেলে দেব সবার সম্মুখে" - বক্তা সবার সম্মুখে কী মেলে দেবে?

উত্তর ঃ

১৮. 'আগামী' কবিতায় বক্তা প্রতিবেশী গাছেদের মুখে কী ফোটাবে?

উত্তর ঃ

১৯. '..... প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়' - কোথায় ঝড় প্রত্যাহত হবে?

উত্তর ঃ

২০. 'জানি তারা মুখরিত হবে' - কীভাবে তারা মুখরিত হবে? 'তারা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ

২১. 'আগামী' কবিতায় কোন্ ঋতুতে বনস্পতির বীজ বৃহতের দলে মিশে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছে?

উত্তর ঃ

২২. কিশলয়কে কীভাবে সকলে সংবর্ধনা জানাবে? কিশলয় কী?

উত্তর ঃ

২৩. "..... পাই আমি তারি তো সম্মতি" - বক্তা কীসের সম্মতি পেয়েছে?

উত্তর ঃ

২৪. "সেদিন ছায়ায় এসো" - কাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে? 'সেদিন' বলতে কোন্ দিনের কথা বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ

২৫. গোপনে মর্মরধ্বনি কোথায় বাজে?

উত্তর ঃ

২৬. কার ডাকে অঙ্কুরিত বীজ সস্নিগ্ধ চোখ মেলেছে?

উত্তর ঃ

২৭. সদ্য অঙ্কুরিত বীজ তার শিকড়ে কী অনুভব করে?

উত্তর ঃ

২৮. "..... মাথা তুলে আমারই আহ্বানে" - কার আহ্বানে কারা মাথা তুলে?

উত্তর ঃ

২৯. কোন্ সময় অঙ্কুরিত বৃক্ষটি বৃহতের দলে মিশে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছে?

উত্তর ঃ

৩০. অঙ্কুরিত বীজ বড়ো হয়ে কী কী দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে?

উত্তর ঃ

৩১. আজ যে অঙ্কুরিত বীজ আগামীতে সে কী হবে?

উত্তর ঃ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩**

১. 'জড় নই মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ'

- কার কথা বলা হয়েছে? বক্তার এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২=৩

উত্তর ঃ কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'ছাড়পত্র' কাব্যের অন্তর্গত 'আগামী' কবিতায় এখানে সদ্যজাত বৃক্ষশিশুর কথা বলা হয়েছে।

বক্তা বলতে চেয়েছে যে সে কোনো জড় অর্থাৎ প্রাণহীন সত্ত্বা নয়। সে ক্ষুদ্র হতে পারে কিন্তু সে নির্জীব বা প্রাণহীন নয়। সে ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের খনিজ পদার্থও নয়। তার মধ্যে রয়েছে প্রাণের স্পন্দন। অন্ধকারের খনিজ যেমন প্রাণহীন অবস্থায় মাটির গর্ভে সঞ্চিত থাকে, তার সাথে অঙ্কুরিত বীজের কোনো তুলনাই চলেনা। আবদ্ধ থাকা নয় বরং খোলা প্রকৃতিতে নিত্য বেড়ে ওঠাই হল অঙ্কুরিত বীজের ধর্ম। তাই সে নিজেকে জড়, মৃত ও অন্ধকারের খনিজ বলে স্বীকার না করে নিজেকে এক জীবন্ত প্রাণ বলে দাবি করেছেন।

২. 'শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা' - বক্তা কে? বক্তার শিকড়ে অরণ্যের বিশাল চেতনা অনুভব করার বিষয়টি বুঝিয়ে বলো। ১+২=৩

উত্তর ঃ উদ্ধৃতাংশটির বক্তা হল কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'ছাড়পত্র' কাব্যের অন্তর্গত 'আগামী' কবিতার বক্তা সদ্য অঙ্কুরিত বীজ।

'আগামী' কবিতাটি একটি রূপকধর্মী কবিতা। কবিতায় মানব শিশুর রূপকার্থে এক বৃক্ষশিশু কথা বলেছে। একজন মানুষের মধ্যেই যেমন একটি সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে, তেমনই অরণ্যের অংশীদারও এক একটি বৃক্ষ। আজকের বৃক্ষশিশুটি আগামীতে মহীরূহে পরিণত হবে। সে বৃক্ষশিশুটিও আগামী বৃহৎ অরণ্যের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে। আর তার আগামী দিনের এই বৃহৎ চিন্তার ভরসা সে শিকড় থেকে পায়। অর্থাৎ বড়ো হয়ে উঠবার চৈতন্যের গান শোনা যায়। এইভাবেই বক্তা তার শিকড়ে অরণ্যের বিশাল চেতনা অনুভব করে।

নিজে করো ঃ

৩. 'আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে;'

- আগামী বসন্তে বক্তা কীভাবে বৃহতের দলে মিশে যাবে? ৩

উত্তর ঃ

৪. "জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।" - কাদের কথা বলা হয়েছে? নব অরণ্যের গানে মুখরিত হওয়ার অর্থ বুঝিয়ে দাও। ১+২=৩

উত্তর ঃ

৫. "সেদিন ছায়ায় এসো।"- কে, কার প্রতি এই আহ্বান জানিয়েছে? 'সেদিন' বলতে কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৬. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আগামী' কবিতায় বর্ণিত অঙ্কুরিত বীজটির বিকাশ পর্ব নিজ ভাষায় ব্যক্ত করো।

উত্তর ঃ

৭. "জানি আমি ভাবী বনস্পতি"

- বক্তা কে? বক্তা নিজেকে ভাবী বনস্পতি বলেছেন কেন? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৮. "তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে"
- কাদের উদ্দেশ্যে বক্তা একথা বলেছে? 'আমি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? বারে বারে হাতছানি দেবার অর্থ বুঝিয়ে দাও। ১+১+১=৩

উত্তর ঃ

৯. "ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই" - বক্তা ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নয় কেন, বুঝিয়ে দাও। ৩

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো : **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫**

১. 'আগামী' কবিতায় কবি ক্ষুদ্র চারাগাছের মধ্য দিয়ে ভাবীকালের সম্ভাবনার যে চিত্র কবি তুলে ধরেছেন, তা নিজ ভাষায় লেখো।

উত্তর ঃ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'আগামী' কবিতাটি একটি রূপকধর্মী কবিতা। কবিতায় এক অঙ্কুরিত বৃক্ষ বীজ বা বৃক্ষশিশু মানব শিশুর রূপক। কবিতায় বৃক্ষশিশুটিকে বক্তা করে কবি এক সমকালীন পরিস্থিতি এবং ভাবীকালের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কবিতায় বৃক্ষশিশুকে ভাবীকালের সম্ভাবনায় বিভোর করে তুলেছেন কবি। তার বিশ্বাস, বর্তমানে সে অঙ্কুরিত ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশু হলেও আগামী দিনে সে বড়ো হয়ে উঠে বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে। তাই কবি বক্তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন - "স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে" এবং "আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে" এই ধরনের সম্ভাবনাময় কথা।

কবির মতে, বৃক্ষশিশুটি বড়ো হয়ে তার দৃপ্ত শাখা মেলে দেবে সবার সম্মুখে। ক্রমশ কঠিন ঝড়ের প্রতিকূলতায় সে নিজেকে সংহত রেখে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। কঠিন শিকড়ে সে আঁকড়ে ধরবে মাটি আর প্রসারিত শাখায় সে প্রতিহত করবে ঝড়। তাই কবি বলেছেন -

"সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়;"

অঙ্কুরিত বৃক্ষশিশুটির এই ধরনের দুঃসাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন অঙ্কুরিত বৃক্ষরা মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং বৃক্ষশিশুটি তার দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে বৃহৎ অরণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর এই কাজে বৃক্ষশিশুকে সম্মতি জানাবে বৃষ্টি ও মাটির রস।

তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষশিশুটি সমৃদ্ধ হয়ে আগামীকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য সে নানা দায়িত্ব পালন করবে। সে ফলে, ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে পান্থজনকে ছায়ায় আসার জন্য আহ্বান জানাবে। মানুষকে পাখির কূজন উপহার দেবে। আর কোনো ঘাতক যদি তাকে এই কাজে বাধা দান করে কিংবা কুঠারাঘাতও করে তবুও সে তাকে বারেবারে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। কারণ ঘাতক এবং বৃক্ষশিশু একই মাটিতে লালিত পালিত এবং পুষ্ট অর্থাৎ একে অপরের 'আপনার জন'। এইভাবেই কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মানব শিশুর রূপকার্থে ক্ষুদ্র চারার মধ্য দিয়ে তার ভাবীকালের সম্ভাবনার চিত্র কবিতায় তুলে ধরেছেন।

২. 'আগামী' কবিতায় অঙ্কুরিত বীজ কীভাবে বৃহতের দলে মিশে যাবে, তা কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো। ৫

উত্তর ঃ

৩. "তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে," -কোন্ রচনার অংশ? কার ক্ষুদ্র শরীরের কথা বলা হয়েছে? লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

৪. "শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা" - কোন্ কবির লেখা, কোন্ কবিতার অংশ? বক্তা কে? বক্তার এই ধরনের মনোভাবের অর্থ পরিস্ফুট করো। ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

৫. 'আগামী' কবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো। ৫

উত্তর ঃ

৬. "তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে।"

- কে, কাকে হাতছানি দেবে? 'তবুও' শব্দটির তাৎপর্য কী? বারে বারে হাতছানি দেওয়ার কারণ বুঝিয়ে দাও। ১+২+২=৫

উত্তর ঃ

*****

একক – ২ (গদ্য)

বাহুবল ও বাক্যবল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি ঃ (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত নৈহাটির অন্তর্গত কাঁঠাল পাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম দুর্গাদেবী। শৈশব থেকে প্রচন্ড মেধার অধিকারী ছিলেন তিনি। মেদিনীপুর হাইস্কুল ও হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করার পর হুগলি কলেজ ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদের একজন। এরপরে তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে ডেপুটি কালেক্টর পদেও দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুরোধে এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশ করেন "Bengali Selection's", ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি সি.আই.ই. উপাধি পান। এছাড়া তিনি 'Society for higher training of young men' সভার প্রতিষ্ঠা দিবসে সাহিত্য শাখার স্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। এটিই পরে 'University Institute' -এ পরিণত হয়।

সাহিত্য সম্ভার

উপন্যাস - "Rajmohan's Wife" (১৮৬৪) (ইংরেজি উপন্যাস), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৬),

রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)

প্রবন্ধ - লোকসাহিত্য, বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৪), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভগবদগীতা (১৯০২), দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী, প্রবন্ধ পুস্তক, কবিতা পুস্তক, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, কৃষ্ণচরিত, ললিতা ও মানস।

পত্রিকা সম্পাদন ঃ বঙ্গদর্শন (১৮৭২)

অবসর জীবন ও মৃত্যু

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে অবসর নিয়ে তিনি কলকাতার বাসায় বসবাস করতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য ছিলেন। অবশেষে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল (১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উৎস

'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিষয় সংক্ষেপ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে প্রথমে বাহুবল ও বাক্যবল কাকে বলে, তা আলোচনা করে উভয় বলের প্রয়োগ, পার্থক্য এবং তারতম্য দেখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সুলতান মহম্মদ এবং মার্জারী উভয়েই বাহুবলে বীর। মহম্মদ ও বিড়ালে যদিও তফাৎ অনেক তবু উভয়ের বীর্যই এক। পৃথিবীর বীর পুরুষগণ ধন্য তেমনি তাদের ইতিহাস রচয়িতাগণ - হেরোডোটাস থেকে কিঙলেক সাহেব পর্যন্ত তাঁরাও ধন্য। তবে স্বীকার করতেই হবে যে বাহুবলের সঙ্গে কিছু বুদ্ধি বা কৌশলের সংযোগ ঘটেছে বলেই এতসব সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধি ছাড়া জীবের শুধু বাহুবলের সার্থকতা নেই।

বাহুবল প্রকৃতপক্ষে পশুবল। সব অবস্থাতেই শেষ নিষ্পত্তিস্থল বাহুবল। বাহুবল সবকিছুর ঊর্ধ্বে। বাহুবলের দ্বারা সবকিছুর নিষ্পত্তি করা যায়। মানুষ সভ্য হলেও কিছুটা পশু সুলভ আচরণ করে, তাই মানুষের প্রধান অবলম্বন বাহুবল। পশুগণের বাহুবল ও মানুষের বাহুবলে কিছুটা প্রভেদ আছে। পশুরা আগে পরে ভাবনা চিন্তা না করেই বাহুবল প্রয়োগ করে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। অনেক পশুর উদরপূর্তির উপায় বাহুবল, পশুরা সমাজবদ্ধ নয়। মানুষ বুদ্ধিদ্বারা বুঝতে পারে যে কোন্ ক্ষেত্রে বাহুবল সমাজের মঙ্গলসাধন করতে পারে।

তখনই মানুষ তাদের বাহুবল প্রয়োগ করে। রাজা লক্ষ লক্ষ সৈনিক রাখেন বাহুবল প্রয়োগের জন্য কিন্তু রাজা যখন দেখেন যে প্রজাগণের ওপর বাহুবল প্রয়োগ করলে বিপরীত ফল হতে পারে তখন তিনি বাহুবল থেকে বিরত থাকেন। এখানে বাহুবল প্রযুক্ত হল না তার প্রধান কারণ মানুষের দূর দৃষ্টি আর গৌণ কারণ হল সমাজবন্ধন।

সমাজবন্ধন সুগঠিত না হলে সামাজিক অত্যাচারের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা। আমাদের শাসনের জন্য বাহুবল প্রয়োজন, এ বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ, নিবারণের মূলে কাজ করে। মানুষ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। কাজেই অনেক সময় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বাহুবল প্রয়োগের সুফল ও কুফল অপরকে বুঝিয়ে দিতে পারেন তবে লোক তা বুঝতে পারে। তখন লোকেরা বাহুবলের অশুভ ফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়।

বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলই শ্রেষ্ঠ। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যা কিছু উন্নতি ঘটেছে, সভ্যতার যা উন্নতি হয়েছে তা কেবল বাক্যবলেই হয়েছে, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি উন্নতির মূলেও রয়েছে বাক্যবল। তাছাড়া কবি, লেখক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা সকলেই বাক্যবলে বলীয়ান।

বর্তমানে মানুষ আগের চেয়ে অনেক উন্নত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ অনেকসময় নানারকম ভয়ে ভীত হয়ে ও সৎকর্ম বা সদানুষ্ঠান করে। এইসকল অনুষ্ঠান সাধারণত জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত হয়না। সাধারণ মানুষ অজ্ঞ, তারা জ্ঞানী ব্যক্তির সদুপদেশ শুনেই সৎকাজে প্রবৃত্ত হয়। বাক্যবলে যেরূপ সমাজের ইষ্ট সাধিত হয় বাহুবলে তা কখনো হয়না।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ছিলেন বাক্যবলে বীর। তাঁদের দ্বারা জগতের যে ইষ্ট সাধিত হয়েছে বাহুবলে বলীয়ানদের দ্বারা এক শতাংশও হয়নি। তবে বাহুবল আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন। আমেরিকার প্রধান উন্নতির সাধনকর্তা ওয়াশিংটন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম এর উন্নতিসাধন কর্তা অরেঞ্জের উইলিয়াম ছিলেন বাহুবলবীর। ভারতের আধুনিক দুর্গতির কারণ বাহুবলের অভাব। তবে মোটের উপর বাক্যবলই প্রধান শক্তি। বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হয়েছে। পশুর বল হল বাহুবল আর মানুষের বল হল বাক্যবল। আবার সবকথাই বাক্যবল নয়। যে কথা বললে অপরে তা শুনে এবং সেইমত কাজ করে উন্নতি সাধন করে সে কথার শক্তিই হল বাক্যবল। এদেশের অবনতির মূলে রয়েছে ভারতবাসীর বাহুবল প্রয়োগের অভাব। বাক্যবলেই সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে, মানুষের চিত্তোৎকর্ষতা সাধিত হয়।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

বাহু = হস্ত, হাত; ইতিবৃত্ত = ইতিহাস, বল = শক্তি, ক্ষমতা; বাক্য = কথা, বাক্; হেরোডোটাস = একজন বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক, পানিপথ = একটি ঐতিহাসিক স্থান,

স্বীকার = মেনে নেওয়া, তৎপর = তারপর, কৌশল = দক্ষতা, নৈপুণ্য; প্রয়োগ = ব্যবহার, সংযুক্ত = জড়িত, একত্রিত; প্রভেদ = পার্থক্য, কার্যকারিতা = উপযোগিতা, তারতম্য = কমবেশি, কার্য = কাজ, কাহাকে = কাকে, সহযোগ = সংযোগ, সাহায্য; ব্যাঘ্র = বাঘ, ভিন্ন = ব্যতীত, ছাড়া; হনন = হত্যা, স্ফূর্তি = প্রকাশ, ভোজন = খাওয়া, খাবার, আহার; ব্যতীত = ছাড়া, অস্তলিজ = অস্টারলিজ, জিত = জয়, সম্মুখে = সামনে, সর্বক্ষম = সবদিক থেকে পটু, মক্ষিকা = মাছি, সর্বত্র = সব জায়গায়, হইতে = হতে, নিষ্পত্তিস্থল = মীমাংসার স্থান, সংস্থাপিত = প্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থি = দড়ি, রক্ষিত = রক্ষণ, প্রস্তর = পাথর, ক্ষুধার্ত = অভুক্ত, অদ্যাপি = আজও, সুলতান মহম্মদ = পারস্যের শাসক, যিনি ভারতবর্ষে কয়েকবার লুণ্ঠন চালান, অদ্যাপি = আজও, কিয়ংদশে = কিছুটা, মার্জারী = স্ত্রী বিড়াল, নিত্য = নতুন, বীর = সাহসী, বলশালী; উদরপূর্তি = পেট ভরানো, বস্ত্রচ্ছেদক = কাপড় কাটে এমন, প্রযুক্ত = প্রয়োগ, প্রভেদ = পার্থক্য, বশীভূত = আওতাধীন, বীর্য = বীরত্ব, অনিষ্ট = ক্ষতি, নিবারন = প্রতিরোধ, ঠেকানো; বিধান = নিয়ম, বন্দোবস্ত = ব্যবস্থা, এতদেশে = এই দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে, প্রত্যহ = প্রতিদিন, জন্মদেশে = আমাদের দেশে, পীড়ন = অত্যাচার, সর্বাংশে = সকল অংশে, আজ্ঞাধীন = আদেশ পালন, অপেক্ষা = থেকে, হইতে; বিরোধ = সংঘর্ষ, অবনতি = অনুন্নতি, সিদ্ধ = সফল, সাধন = সম্পাদন, অনুগ্রহ = উপকার, তদর্থে = সেই অর্থেই, দূরদৃষ্টি = ভবিষ্যত দেখা, বিবেচনা করার ক্ষমতা, গৌণ = অপ্রধান, প্রযুক্ত = সংযুক্ত, নিযুক্ত; নিরাকৃত = আকারহীন, পরিত্যাগ = পরিত্যক্ত, বর্জন, বিসর্জন; প্রবৃত্ত = নিযুক্ত, অজ্ঞ = বোকা / মূর্খ, নিত্য = নতুন, হৃদয়ক্ষমতা = বুঝতে সক্ষম, আশঙ্কা = ভয়, বিপ্লুত = আবিষ্ট, তীক্ষ্ণদৃষ্টি = সতর্কদৃষ্টি, যাছশ = যেরূপ, পথগামী = পথের উদ্দেশ্যে রওনা, ইষ্ট = মঙ্গল, কল্যাণ; গন্তব্য = গমনস্থল, ব্যক্ত = প্রকাশ, গমন = যাওয়া, তত্ত্ব = পদ্ধতি, পীড়িত = অত্যাচারিত, উদ্ভূত = প্রকাশ, উৎপীড়ন = পীড়া, নিগ্রহ; বক্তা = কথক, যে বলে, নিরস্ত = থামানো, বিরত করা; হৃদয়গত = মনোগত, মনের মধ্যে; অবগত = জ্ঞাত, সমবায় = একত্রিতকরণ, সম্মিলিত; প্রবৃত্তি = ইচ্ছা, হস্তগত = করায়ত্ত, দখলীকৃত; নিবৃত্তি = বিরতকরণ, নিহিত = গুপ্ত, গোপনে স্থাপিত; অতিশয় = অনেক, পৃথকভুত = আলাদা করা, একত্রিত = সমবেত, মিলিতভাবে

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ **মান - ১**

১. 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?

উত্তর - 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটির রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২. 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটি কোন্ পত্রিকায়, কোন্ সময়ে প্রকাশিত হয়?

উত্তর - 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায়, ১২৮৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়।

৩. 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটি কোন্ মূলগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর - 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটি 'বিবিধপ্রবন্ধ' শীর্ষক মূলগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪. 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটি কোন্ উদ্দেশ্যে লিখিত?

উত্তর - সামাজিক অত্যাচার বা দুঃখ কীভাবে দূর করা যায় সেই উপায় সন্ধানের জন্য প্রবন্ধটি লিখিত।

৫. বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের শুরুতে পাঠকদের কি বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর - বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের শুরুতেই বাহুবল ও বাক্যবল কাকে বলে তা বোঝাতে চেয়েছেন।

৬. ব্যাঘ্র কোন্ বলে হরিণশিশুকে হনন করে ভোজন করে?

উত্তর - ব্যাঘ্র বাহুবলে বলে হরিণশিশুকে হনন করে ভোজন করে।

৭. ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে কেন হনন করে?

উত্তর - ব্যাঘ্র তার উদরপূর্তির জন্য হরিণশিশুকে হনন করে।

৮. 'আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম' - কে, কী দেখলেন?

উত্তর - লেখক বঙ্কিমচন্দ্র লেখতে লেখতে দেখলেন, তাঁর সামনে একটি টিকটিকি একটি মাছি ধরে খেল।

৯. কালামুখী মার্জারী কী?

উত্তর - কালামুখী মার্জারী হল একটি কালামুখো স্ত্রী বিড়াল।

১০. সোমনাথ মন্দির কে লুণ্ঠন করেছিল?

উত্তর - সুলতান মোহম্মদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছিল।

১১. 'পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য।' - পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য কেন?

উত্তর - বাহুবলে অনেক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করেছেন বলে পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য।

১২. 'উভয়েই বীর - বাহুবলে বীর।' - এখানে 'উভয়' বলতে কাদের বীরত্বের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর - এখানে উভয় বলতে সুলতান মোহম্মদ ও কালামুখী মার্জারির বীরত্বের কথা বলা হয়েছে।

১৩. সুলতান মোহম্মদ ও একা মার্জারিতে প্রভেদ কী?

উত্তর - সুলতান মেহাম্মদ ও একা মার্জারিতে সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ রয়েছে।

১৪. প্রাবন্ধিক বঙ্কিম সাগরের জলকে কীসের সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর - প্রাবন্ধিক বঙ্কিম সাগরের জলকে শিশির বিন্দুর জলের সাথে তুলনা করেছেন।

১৫. কোন্ বল বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে কার্যকারিতা ঘটে না?

উত্তর - বুদ্ধিবল বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে কার্যকারিতা ঘটে না।

১৬. কী ব্যতীত জীবের কোনো বলেরই স্ফূর্তি নেই?

উত্তর - বুদ্ধি ব্যতীত জীবের কোনো বলেরই স্ফূর্তি নেই।

১৭. বাহুবলকে প্রকারান্তরে কী বলা হয়?

উত্তর - বাহুবলকে প্রকারান্তরে পশুবল বলা হয়।

১৮. ইহজগতের উচ্চ আদালত বলতে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেছেন?

উত্তর - ইহজগতের উচ্চ আদালত বলতে লেখক বাহুবলকে ইঙ্গিত করেছেন।

১৯. 'সকল আপিলের উপর আপিল এইখানে; ইহার উপর আর আপিল নাই।' - কার উপর আর আপিল নেই?

উত্তর - বাহুবলের উপর আর আপিল নেই।

২০. বাহুবল কেন মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন?

উত্তর - মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু বলে বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

নিজে করো ঃ মান-১

২১. পশুগণের বাহুবলে ও মনুষ্যের বাহুবলে প্রভেদ কোথায়?

উত্তর -

২২. পশুগণ কেন বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করতে পারে না?
উত্তর -

২৩. 'মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে' - মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা কী বুঝতে পারে?
উত্তর -

২৪. 'সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল।' - 'সেটুকু' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর -

২৫. কোন্ বিষয়টি সকল সামাজিক অবস্থার নিত্যকারণ?
উত্তর -

২৬. 'তাহা সকলে অবগত আছেন' - কোন্ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর -

২৭. দ্বিতীয় জেমস কে?
উত্তর -

২৮. কোন্ বল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না?
উত্তর -

২৯. কার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে?
উত্তর -

৩০. কখন বাহুবল বিনা প্রয়োগে কার্য সিদ্ধ করে?
উত্তর -

৩১. কোন্ বল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ?
উত্তর -

৩২. কোন্ বল মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট সাধন করে?
উত্তর -

৩৩. বাক্যবল কীভাবে বাহুবলের কার্য সিদ্ধ করে?
উত্তর -

৩৪. বাক্যবল কী?
উত্তর -

৩৫. বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে কোন্ বল প্রয়োগের সম্ভাবনা নেই বলে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন?
উত্তর -

৩৬. সামাজিক অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায় কী?
উত্তর -

৩৭. কোন্ বলের বিশেষ প্রকার উন্নতির প্রয়োজন বলে বঙ্কিম তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন?
উত্তর -

৩৮. বাহুবল ও বাক্যবলের মধ্যে কোন্ বল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়?
উত্তর -

৩৯. এ পর্যন্ত কোন্ বল প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়েছে?
উত্তর -

৪০. সভ্যতার উন্নতি কীসে ঘটেছে?
উত্তর -

৪১. বাক্যবলের দ্বারা কী কী বিষয়ের উন্নতি ঘটেছে?
উত্তর -

৪২. বাক্যবলে বলীয়ান কারা?
উত্তর -

৪৩. মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ কোন্ বলে বলীয়ান?
উত্তর -

৪৪. মুসা কে?
উত্তর -

৪৫. ইসা কে?
উত্তর -

৪৬. শাক্যসিংহ কে?
উত্তর -

৪৭. আত্মরক্ষার জন্য কোন্ বল শ্রেষ্ঠ?
উত্তর -

৪৮. আমেরিকার প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা কে?
উত্তর -

৪৯. হলান্ড বেলজিয়ামের প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা কে?
উত্তর -

৫০. ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ কি?
উত্তর -

৫১. কোন্ বল প্রয়োগের দ্বারা জগতের ইষ্ট সাধিত হয়েছে?
উত্তর -

৫২. বাহুবল ও বাক্যবলের মধ্যে প্রভেদ কী?
উত্তর -

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **মান - ৩**

১. পশুগণের বাহুবলে এবং মানুষের বাহুবলে যেসব পার্থক্য দেখা যায় তা 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর - সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে বাহুবল ও বাক্যবলের নানা তারতম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। লেখকের মতে বাহুবল ও বাক্যবল দুটিরই আলাদা আলাদা শক্তি আছে। তিনি বলেছেন বাহুবল পশুবল সম। কারণ পশু বাহুবল প্রয়োগ না করে টিকে থাকতে পারবে না। লেখকের মতে মানুষও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পশুর সমতুল্য। তবে উভয়ের বাহুবলে গুরুতর পার্থক্য আছে। পশুরা বুদ্ধি বিবেচনাহীন বলে তারা নিত্য বাহুবল প্রয়োগ করে। কিন্তু মানুষের নিত্য বাহুবল প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়েনা। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি থাকায় বিরুদ্ধশক্তি চরম সীমায় না পৌঁছোলে তারা বাহুবল ব্যবহার করে না। পশুরা সামাজিক বন্ধন বা শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নয় তাই তারা বাহুবল কখন ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে তারা অবগত হতে পারেনা। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই তাদের বাহুবল প্রয়োগের আগে সে বিষয়ে গভীর বিবেচনা করতে হয়। মানুষের দূরদৃষ্টি ও সমাজবন্ধনের দায়বদ্ধতা থাকলেও পশুদের নেই। উপরিউক্ত এই সকল পার্থক্যগুলো বাহুবল প্রয়োগে পশু ও মানুষদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন লেখক।

২. "সাগরও জল - শিশিরবিন্দুও জল।"

- কোন্ রচনার অন্তর্গত? লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+২ = ৩

উত্তর - উদ্ধৃতিটি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বাহুবল ও বাক্যবল' রচনার অন্তর্গত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপরিউক্ত বাক্যাংশটি মূলত উপমার ব্যবহার। তিনি প্রবন্ধে বলেছেন যে সুলতান মোহম্মদ লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। মূলত সেই আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল বাহুবলের প্রয়োগের মাধ্যমে। লেখকের মতে সেই একই বলে কালামুখী মার্জারীও ইঁদুর শিকার করে। উভয়ে বাহুবল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংখ্যা ও শরীরের পার্থক্য রয়েছে। প্রবন্ধে সুলতান মোহম্মদের বাহুবলকে 'সাগর' এবং কালামুখী মার্জারীর বাহুবলকে 'শিশিরবিন্দু'র সাথে তুলনা করা হয়েছে।

নিজে করো ঃ (মান- ৩)

৩. "বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের স্ফূর্তি নাই" - কে, কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছেন? এ বিষয়ে লেখক যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা উল্লেখ করো। ১+২=৩

উত্তর ঃ

৪. "ইহার উপর আর আপিল নাই"
- কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করেন? এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৫. "এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ"
- প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বাক্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৩

উত্তর ঃ

৬. "তাহা সকলে অবগত আছেন" - কোন্ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে? বক্তা উক্তিটির মধ্য দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছেন? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৭. "পৃথিবীর বীর পুরুষগণ ধন্য।" - এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? - প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কী কারণে তারা ধন্য তা বুঝিয়ে দাও। ১+২=৩

উত্তর ঃ

৮. "সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে।"
- বাক্যবলে কীভাবে সভ্যতার উন্নতি ঘটেছে তা আলোচনা করো। ৩

উত্তর ঃ

৯. "সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ।" - কোন্ রচনার অন্তর্গত? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য লেখো। ১+২=৩

উত্তর ঃ

১০. "অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতি প্রয়োজন" - লেখকের এরূপ উক্তির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

উত্তর ঃ

১১. "বুদ্ধি ব্যতীত জীবের কোনো বলেরই স্ফুর্তি নাই।"
- মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৩

উত্তর ঃ

১২. "উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।" - উভয়ের সমবায় বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন, তা আলোচনা করো। ৩

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ মান - ৫

১. "বাহুবল ও বাক্যবল" পাঠ্যাংশে লেখক বলেছেন, 'বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।' - তিনি কেন একথা বলেছেন তা যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

অথবা,

'বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল শ্রেষ্ঠ' - এর কারণ বিশ্লেষণ করো।

উত্তর- সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "বাহুবল ও বাক্যবল" প্রবন্ধে মূলত উভয় বল অর্থাৎ বাহুবল এবং বাক্যবল সম্পর্কে নানা যুক্তিসংগত কথা বলেছেন। লেখকের মতে বাহুবল, পশু এবং মানুষ উভয়েরই আছে। তবে পশুদের আত্মরক্ষা এবং খাবার সংগ্রহের জন্য বাহুবল প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করতে হয়। ভালো-মন্দ বিচার না করেই পশুরা বাহুবল প্রয়োগ করে। অথচ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে, ভালোমন্দ বিচার করে বলে প্রতিনিয়ত মানুষকে বাহুবল প্রয়োগ করতে হয়না। তবে প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন মানুষের মধ্যে এখনো কিছু পাশবিক স্বভাব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষও বাহুবলে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু সেসবের ফল সীমাবদ্ধ। লেখক প্রবন্ধে আমেরিকার ওয়াশিংটন, হল্যান্ডের অরেঞ্জের উইলিয়াম ইত্যাদির উদাহরণ টেনে বলেছেন যে তাঁদের বাহুবলে দেশে উপকার হয়েছে কিন্তু তা শুধু সীমাবদ্ধ এলাকার জন্য। তবে এটাও সত্যি যে তাদের বাহুবলে মনুষ্য সংহারের মতো কার্যও সম্পন্ন হয়েছে এবং রক্তপাতের মতো জঘন্য ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে বাহুবলের দ্বারা।

অপরদিকে আরেকটি বল অর্থাৎ বাক্যবলের কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, কখনো দেখা গেছে যেখানে বাহুবলের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী, সেখানে একটি কথা বা বাক্যতেই তা স্থগিত হয়ে যায়। বাক্যবলে অনেক অসৎপন্থী লোক সৎপথগামী হয়। বাক্যবলের ক্ষমতা ও তাৎপর্যপূর্ণ শক্তির কথা বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রমুখ

বাক্যবীরের কথা বলেছেন, যাঁরা বাক্যের শক্তি দিয়েই মানবসমাজের মঙ্গল সাধন করেছেন। কারণ বাক্যবল এমনই একটি বল, যে বলের দ্বারা বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনাকে নিরস্ত করা যায়। পৃথিবীর বহু মানুষ এখনো তাঁদের বাণী স্মরণ করে। বাক্যবলের দ্বারাই তাঁরা অমর। পৃথিবীতে বহু বাক্যবীর এই বাক্যবলে ইষ্টসাধন করেছেন। বাহুবলে বলীয়ানদের নাম কেবল ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে বা থাকবে কিন্তু বাক্যবলে বলীয়ানদের নাম মানুষের হৃদয়ে লেখা থাকবে। তাই প্রাবন্ধিক বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

নিজে করো ঃ

২. "মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন - বাক্যবীর মাত্র।" - প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৫

উত্তর ঃ

৩. বাহুবল ও বাক্যবল রচনায় প্রাবন্ধিক বাহুবলের কী কী উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা উল্লেখ করো। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের কোন্ অভিমত প্রকাশ পেয়েছে তা লেখো। ৩+২=৫

উত্তর ঃ

৪. সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আলোচনা করো। ৫

উত্তর ঃ

৫. "এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।" - বক্তা কে? দুইবল কী কী? এই দুইবলের মধ্যে কী কী পার্থক্য বর্তমান তা লেখো। ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

*****

একক – ২ (গদ্য)

কবিতা ও বিজ্ঞান

জগদীশচন্দ্র বসু

লেখক-পরিচিতি ঃ (১৮৫৮ - ১৯৩৭)

বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের অন্যতম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক এবং তার সাথে সাথে দক্ষ একজন সাহিত্যিক। তিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু ও মাতা বামাসুন্দরী দেবী। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখালি গ্রামে।

জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম স্কুল ছিল 'ময়মনসিংহ জিলা স্কুল'। সেখানকার পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতায় আসেন। প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভরতি হন। তারপর বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র বিলেতে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি. ডিগ্রি নিয়ে ১৮৮৫ সালে দেশে ফিরে আসেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর সমগ্র গবেষণাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত ঃ বিদ্যুৎ, দ্বিতীয়ত ঃ চুম্বক তরঙ্গ এবং তৃতীয়ত ঃ উদ্ভিদের জীবন রহস্য নিয়ে গবেষণা। তিনি বিনা তারে বার্তা প্রেরণের উপায় থেকে শুরু করে স্বয়ংলেখ যন্ত্র উদ্‌ভাবন ও বৃক্ষের প্রাণের সন্ধানও দিয়েছিলেন। তিনি ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের পর ১৯১৭ সালের ৩০ শে নভেম্বর তিনি গড়ে তুলেন 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' যা সমগ্র ভারতে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার হিসাবে পরিচিত ছিল।

জগদীশচন্দ্র বসু মূলত বিজ্ঞান সাধনাই করতেন। তবে বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রবন্ধ রচনাতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বাংলা

ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন সাহিত্যের বিভিন্ন পত্রিকায়। যেমন -'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'সাহিত্য', 'মুকুল' ইত্যাদি। পরবর্তীতে তাঁর ঐসকল প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত হয়। জগদীশচন্দ্র বসু তথা বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উৎসগ্রন্থ

জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধটি 'অব্যক্ত' গ্রন্থের দশম প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' এর 'কবিতা ও বিজ্ঞান' নামের একটি অংশ। মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আগ্রহে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বাংলা 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

পাশ্চাত্য দেশে = পশ্চিম দেশে, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত দেশে; ভেদবুদ্ধি = পার্থক্যবোধ, বিরোধের মনোভাব; জ্ঞান রাজ্যে = বিদ্যাবুদ্ধির জগতে, প্রচলন = প্রবর্তন, স্বতন্ত্র = আলাদা, পৃথক; আয়োজন = উদ্যোগ, ব্যবস্থা; লুপ্তপ্রায় = লোপ পাচ্ছে এমন, প্রথমাবস্থা = প্রথম অবস্থায়, প্রথা = রীতি, উপকরণ = উপাদান, সংগ্রহ = জোগাড়, সজ্জিত = সাজানো, অনুসরণ = অনুকরণ, পূর্ণমূর্তি = পুরো রূপ, প্রত্যক্ষ = চোখের সামনে দেখা, সিদ্ধি = সাধনার দ্বারা ইষ্টলাভ, সাফল্য; দর্শন = দেখা, অবলোকন করা; প্রবল = প্রচন্ড, তীব্র; অন্বেষণে = খোঁজে, অজ্ঞাতসারে = আমাদের অজান্তে, সর্বব্যাপী = সর্বত্র বিদ্যমান, অগ্রসর = এগিয়ে যাওয়া, বৃহৎ = বড়ো, উৎসুক = আগ্রহী, প্রকৃতরূপে = সঠিকভাবে, হৃদয়ের দৃষ্টি = মনের দৃষ্টি, অরূপ = যে রূপ সাধারণত দেখা যায় না, নিরাকার; অপরূপ = অতুলনীয় রূপ বিশিষ্ট, অবরুদ্ধ = বন্ধ, বার্তা = খবর, সংবাদ; আভাস = ইঙ্গিত, পন্থা = পথ, ঐক্য = একতা, মিল; আলোক = আলো, শ্রুতি = শ্রবণ, কম্পমান = যা কাঁপছে, আহরণ = সংগ্রহ, রহস্য = গূঢ়তত্ব, আড়াল = অন্তরাল, দুর্বোধ = দুরূহ, দুর্বোধ্য; যথাযথ = যথাযোগ্য, যথার্থ; ব্যক্ত = প্রকাশ, নিযুক্ত = রত, যুক্ত; নিকেতন = গৃহ, আলয়; দ্বার = দরজা, অসংখ্য = অগণিত, প্রচুর; গতিবিধি = চালচলন, কার্যকলাপ; জীবতত্ত্ববিদ = প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অলঙ্ঘ্যভাবে = লঙ্ঘন করা যায়না এমনভাবে, বিভক্ত = বিভাগ, ভাগ; স্বীকার = মেনে নেওয়া, কক্ষে = কামরায়, প্রকোষ্ঠে; অধিষ্ঠাতা =

প্রতিষ্ঠাতা, পরিশেষে = সবশেষে, অসংখ্য = অগণিত, বিরোধ = বিরুদ্ধ, বিরোধিতা, অনুভূমি = উপলব্ধি, বোধ; অনির্বচনীয় = অবর্ণনীয়, ভাষায় প্রকাশ করা যায়না এমন; প্রভেদ = পার্থক্য, বিভেদ; আত্মহারা = বিহ্বল, উপেক্ষা = অবহেলা, অসাধ্য = সাধ্যের অতীত, আত্মসংবরণ = আত্মসংযম, নিজেকে সংযত করা, বন্ধুর = উঁচু নীচু, এবড়োখেবড়ো; পর্যবেক্ষণ = নিরীক্ষণ, তত্ত্বাবধান; পরীক্ষণ = পরীক্ষা করা, গবেষণা; ফাঁকি = প্রতারণা, ছলনা; অপরিসীম = সীমাহীন, অসীম; অভিমুখ = সম্মুখ, দিক; বিস্ময় = আশ্চর্যভাব, সংশয়; উত্তীর্ণ = সফল, স্থূল = জড়তাযুক্ত, আবরণ = ঢাকনা, অপসারণ = দূর হয়েছে এমন, অচিন্তনীয় = যা চিন্তাও করা যায়না, অভিভূত = ভাবের দ্বারা আবিষ্ট, বিহ্বল।

বিষয় সংক্ষেপ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক মনের অন্তরালে যে এক দার্শনিক ও সাহিত্যিক মন লুকিয়ে ছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শুরুতে তিনি বলেছেন পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। ফলে নিজেকে এক করে জানবার চেষ্টা লুপ্ত হয়েছে। তবে জ্ঞান সাধনার প্রথম দিকে এরূপ চেষ্টা চলতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত যদি এই রীতি চলতে থাকে তাতে সত্যের পূর্ণপ্রাপ্তি ঘটে না। তাই লেখক বলেছেন - "কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাইনা"। অপরদিকে বহুর মধ্যে যাতে হারিয়ে না যায় ভারতবর্ষ সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখে চলেছে। ফলে জ্ঞানের সন্ধানে আমরা অজ্ঞাতসারে সর্বব্যাপী ঐক্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

প্রাবন্ধিক প্রবন্ধে বলেছেন যে, কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একটি অরূপকে দেখতে পান এবং তা একটি রূপের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেণ। তিনি অপরূপ দেশের বার্তা তাঁর কবিতার ছন্দে ফুটিয়ে তোলেন। বৈজ্ঞানিকের পথ ভিন্ন হলেও কবির ভাবসাধনার সঙ্গে তার সাধনার সাদৃশ্য রয়েছে। দৃষ্টির আলোক নজরে না এলেও তিনি সেখানে আলোকের অনুসন্ধান করেন, শ্রবণ ক্ষমতা যেখানে সুরের শেষ প্রান্তে পৌঁছায় সেখান থেকেও তিনি কম্পমান বাক্য সংগ্রহ করে আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য রয়েছে বৈজ্ঞানিক সেখান থেকেই দুর্বোধ্য উত্তর বের করেন এবং তা সাধারণ মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করেন। লেখক বলেছেন প্রকৃতির রহস্য নিকেতনে নানা মহল বর্তমান। কিন্তু সকল মহলেরই অধিষ্ঠাতা একজন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানবিদ, রসায়ন শাস্ত্রবিদ এবং জীববিদ্যা বিশারদগণ আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে মহলে প্রবেশ করে মনে করেন সেই মহলই তাঁর একমাত্র স্থান। এজন্যই তাঁরা (বৈজ্ঞানিকরা) জড় ও উদ্ভিদ জগৎকে অলঙ্ঘ্যভাবে বিভাগ করেছেন। কিন্তু

প্রাবন্ধিকের মতে এই বিভাগকে দেখাই যে কেবল বৈজ্ঞানিক দেখা, শুধুমাত্র তা নয়। কারণ সকল মহলেরই অধিষ্ঠাতা একজন। সকল বিজ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করে শেষে একমাত্র সত্যকেই আবিষ্কার করবে বলে বেরিয়েছে। সকল পথ যেখানে মিশেছে সেখানেই পূর্ণসত্য বিদ্যমান।

লেখকের মতে কবি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় 'এক' এর সন্ধানে বের হয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে গতির প্রভেদ রয়েছে। কবি পথের কথা ভাবেন না আর বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সবসময় আত্মহারা হতে হয়, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিককে বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের কঠোর পথে অগ্রসর হতে হয় বলে তাঁকে সর্বদা আত্মসংবরণ করে চলতে হয়। তাছাড়া কবির ক্ষেত্রে আবেগ বাইরে প্রয়োগ করার সময় উপমা প্রয়োগ করতে হয়। কারণ - "..... কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারেনা"। এই জন্য সকল কথাতেই তাকে (কবিকে) 'যেন' কথাটি যোগ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিকরা কঠিন নিশ্চিতের পথে দিয়ে চলা সত্ত্বেও তাঁরা অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলেছেন। বৈজ্ঞানিকরা এমন রাজ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন যেখানে আলোকরশ্মির সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা নিস্ফল হচ্ছে এবং সেখানে বস্তু ও শক্তি এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে হঠাৎ চোখের আবরণ দূর হয়ে যখন এক চিন্তার অতীত রাজ্যের দৃশ্য বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য বৈজ্ঞানিকও নিজেকে সংযত করতে ভুলে যান এবং বলে উঠেন 'যেন' নহে-এই সেই।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **মান -১**

১. 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?

উত্তর - জগদীশচন্দ্র বসুর 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়েছে।

২. জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি কবে প্রকাশিত হয়?

উত্তর - জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

৩. 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর - 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. এখন কোথায় জ্ঞান রাজ্যে ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হয়েছে?

উত্তর - এখন পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞান রাজ্যে ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হয়েছে।

৫. পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান রাজ্যে কীসের আয়োজন চলেছে?

উত্তর - পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান রাজ্যের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখার জন্য বিশেষ আয়োজন চলেছে।

৬. জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে 'জাতিভেদ প্রথা' কখন উপকার করে?

উত্তর - জ্ঞানসাধনার প্রথম অবস্থায় স্বতন্ত্রকরণ প্রথা বা 'জাতিভেদ প্রথা' উপকার করে।

৭. "তাহা হইলে সত্যের পূর্ণ মূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠেনা," -কীসের ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়?

উত্তর - জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথাকে যদি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়, তাহলে সত্যের পূর্ণ মূর্তি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবেনা।

৮. জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কোন্ দিকে সর্বদা লক্ষ রেখেছে?

উত্তর - জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে বহুর মধ্যে যাতে হারিয়ে না যায়, ভারতবর্ষ সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রেখেছে।

৯. জ্ঞান অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কোন্ ব্যাপারে উৎসুক হয়েছি?

উত্তর - জ্ঞান অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানার ব্যাপারে উৎসুক হয়েছি।

১০. জ্ঞান অন্বেষণে ভারতবর্ষ অজ্ঞাতসারে কোন্ দিকে অগ্রসর হচ্ছে?

উত্তর - জ্ঞান অন্বেষণে ভারতবর্ষ অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

১১. হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে কবি কী দেখতে পান?

উত্তর - হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে কবি একটি অরূপকে দেখতে পান।

১২. এই বিশ্বজগতে অরূপকে কবি কীভাবে প্রকাশ করেন?

উত্তর - এই বিশ্বজগতে অরূপকে কবি রূপের মধ্যে প্রকাশ করেন।

১৩. "তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।" - কে, কাকে রূপের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন?

উত্তর - কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করা অরূপকে রূপের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

১৪. "অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়না"

- এখানে 'তাহার' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে?

উত্তর - এখানে 'তাহার' বলতে কবির কথা বোঝানো হয়েছে।

১৫. কার পন্থা স্বতন্ত্র হতে পারে বলে লেখকের ধারণা?

উত্তর - বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হতে পারে বলে লেখকের ধারণা।

১৬. কবিত্ব সাধনার সঙ্গে কার সাধনার ঐক্য রয়েছে?

উত্তর - কবিত্ব সাধনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের সাধনার ঐক্য রয়েছে।

১৭. কবির অপরূপ দেশের বার্তা কোথায়, কীভাবে প্রকাশ পায়?

উত্তর - কবির অপরূপ দেশের বার্তা তাঁর কাব্যের ছন্দে নানা আভাসের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

১৮. কোথা থেকে বৈজ্ঞানিক কম্পমান বাণী আহরণ করে আনেন?

উত্তর - শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছোয়, সেখান থেকেও বৈজ্ঞানিক কম্পমান বাণী আহরণ করে আনেন।

১৯. "ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য" -কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর - প্রকৃতির যে রহস্য নিকেতন - তার নানা মহল ও অসংখ্য দ্বারের কথা বলা হয়েছে।

২০. "সেজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই.....।" - কে, কী দেখতে পান?

উত্তর - জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিদিনই দেখতে পান যে, জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারিয়ে ফেলছে।

২১. জগদীশচন্দ্র বসুর মতে কোথায় পূর্ণ সত্য রয়েছে?

উত্তর - জগদীশচন্দ্র বসুর মতে সকল পথ সেখানে একত্রে মিলেছে সেখানেই পূর্ণ সত্য রয়েছে।

নিজে করো ঃ (মান - ১)

২২. সকল জ্ঞানের পথ কোথায় গিয়ে মিশেছে?

উত্তর -

২৩. সত্য কীভাবে অবস্থিত নয় বলে লেখকের ধারণা?

উত্তর -

২৪. জগদীশচন্দ্র বসুর মতে কে পথের কথা ভাবেন না?

উত্তর -

২৫. কে পথটাকে উপেক্ষা করেন না?

উত্তর -

২৬. কীসের সন্ধানে বৈজ্ঞানিক ও কবির অনুভূতি বেরিয়েছে?

উত্তর -

২৭. কবির পক্ষে কী অসাধ্য?

উত্তর -

২৮. জগদীশচন্দ্র বসুর মতে কাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করতে হয়?

উত্তর -

২৯. সকল কথায় কবিকে কী যোগ করতে হয়?

উত্তর -

৩০. জগদীশচন্দ্র বসুর মতে বৈজ্ঞানিককে সর্বদা আত্মসংবরণ করে চলতে হয় কেন?

উত্তর -

৩১. 'পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়।' - লেখকের মতে এই ভাবনাটি কার?

উত্তর -

৩২. পূর্ণ সত্য কী?

উত্তর -

৩৩. 'দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনো মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না'

- এখানে 'তিনি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর -

৩৪. জগদীশচন্দ্র বসুর মতে বৈজ্ঞানিক তাঁর অনুসৃত পথে কোন্ অভিমুখে চলেছেন?

উত্তর -

৩৫. "বলিয়া উঠেন 'যেন' নহে এই সেই" - কে বলে ওঠেন?

উত্তর -

৩৬. বৈজ্ঞানিকের পথ কীরূপ?

উত্তর -

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ মান - ৩

১. "কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।" - প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কে, কোথায় এই উক্তিটি করেছেন তা লেখো। ২+১=৩

উত্তর - প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, তথা সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে,

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নানা শাখা-প্রশাখার প্রচলন আছে। এই সকল শাখা-প্রশাখা ধরেই শিক্ষার অগ্রগতি চলতে থাকে। লেখকের মতে, তাতে করে প্রথম দিকে কিছুটা সুবিধা হয়। কিন্তু এই প্রথা সবসময় অনুসরণ করলে সত্যের পূর্ণরূপ অবলোকন করা হয়ে ওঠেনা। আর এই প্রসঙ্গেই লেখক উপরিউক্ত উক্তিটি করেছেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

২. "কবিত্ব সাধনার সহিত তাহার সাধনার ঐক্য আছে"- বৈজ্ঞানিক পন্থার সাথে কবিত্ব সাধনার কী ঐক্য রয়েছে, তা লেখো।

উত্তর - বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক ও কবির জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে অবলম্বনকৃত পথের নানা পার্থক্য বা বিভেদ রয়েছে স্বীকার করলেও কবির কবিত্ব সাধনার সাথে বৈজ্ঞানিকের সাধনার মিল রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। কবি তাঁর অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বজগতে অরূপের সন্ধান করে তা কাব্যছন্দে প্রকাশ করেন। আর বৈজ্ঞানিকও দৃষ্টির আলোর পথের শেষেও আলোর খোঁজ করেন। কবির পথ অবলম্বন করেই বৈজ্ঞানিক কম্পমান বাণী সংগ্রহ করেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য দিনরাত দৃষ্টির আড়ালে কাজ করছে, বিজ্ঞানী তাকেও প্রশ্ন করে দুর্বোধ্য উত্তর বের করেন তা যথাযথ ভাষায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কাজ করে যাচ্ছেন। তাই প্রাবন্ধিক অরূপের সন্ধান ও প্রকাশের চেষ্টার মধ্যে কবিত্ব সাধনার সাথে বৈজ্ঞানিকের সাধনার ঐক্যকে স্বীকার করেছেন।

নিজে করো ঃ

৩. "দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।"-কোন্ রচনার অংশ? লেখকের এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৪. "ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ রাখিয়াছে।" - ভারতবর্ষ কোন্ দিকে লক্ষ্য রেখেছে? এর ফলস্বরূপ কী হয়েছে? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৫. "সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য" - কোন্ রচনার অংশ? কোন্ সত্যের কথা বলা হয়েছে? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৬. "প্রভেদ এই" - কাদের প্রভেদের কথা বলা হয়েছে? প্রভেদটি কী? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৭. "ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি।" - আমরা কারা? উক্তিটির প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দাও। ১+২=৩

উত্তর ঃ

৮. 'এজন্য তাহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়'
- উপমার ভাষাটি কী? কাকে, কেন উপমার ভাষা ব্যবহার করতে হয়? ১+২=৩

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ মান - ৫

১. "মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন 'যেন' নহে এই সেই" - কে বলে ওঠেন? কখন তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপণীত হন তা আলোচনা করো।

উত্তর - বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' প্রবন্ধের অংশ 'কবিতা ও বিজ্ঞান' শীর্ষক পাঠ্যাংশে উক্ত উক্তিটি করেণ বৈজ্ঞানিক।

আলোচ্য 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে লেখক কবি ও বৈজ্ঞানিকের স্বতন্ত্র পথের কথা উল্লেখ করেছেন। তার সাথে তাদের সাধনার মধ্যে যে ঐক্যতা রয়েছে সে কথাও স্বীকার করেছেন। তাছাড়া প্রাবন্ধিক বলেছেন কবিদের মতো বৈজ্ঞানিকেরও দৃষ্টির আলোক যেখানে

শেষ হয়ে যায়, সেখানেও তিনি আলোর অনুসরণ করতে থাকেন। শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেখান থেকেও তিনি কম্পমান বাণী সংগ্রহ করে আনেন। লেখক আরও বলেছেন প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসে দিনরাত কাজ করছে, বৈজ্ঞানিক তাকে প্রশ্ন করে দুর্বোধ্য উত্তর বের করে আনেন এবং সেই উত্তরকে মানব ভাষায় যথাযথভাবে ব্যক্ত করেন।

তবে বৈজ্ঞানিকদের যে পথ অনুরসণ করতে হয়, তা একান্ত বন্ধুর। বৈজ্ঞানিককে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁকে সর্বদা আত্মসংবরণ করে চলতে হয়, এবং সবসময় বৈজ্ঞানিককে সচেতন থাকতে হয় যে, পাছে নিজের মন যাতে নিজেকে ফাঁকি দিতে না পারে। আর বৈজ্ঞানিক এই কারণে সবসময় মনের কথাটা বাইরের সাথে মিলিয়ে চলতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিককে এমন কঠিন নিশ্চিতের পথেও অনেক অপরিসীম রহস্যের অভিমুখ দিয়ে যেতে হয়। আর বৈজ্ঞানিকরা এর ফলে এক বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন, যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর বিস্ময়ের রাজ্যে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একবারেই শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হয়ে এক অচিন্তণীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভুত করে তখনই বৈজ্ঞানিকরা মুহূর্তের জন্য নিজের স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করতে ভুলে যান এবং বলে উঠেন 'যেন' নহে এই সেই। অর্থাৎ কোনোরকম অস্পষ্টতা না রেখে বৈজ্ঞানিক তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফল নিশ্চিতরূপেই লাভ করেন।

নিজে করো ঃ

২. কবিকে কেন উপমার ভাষা ব্যবহার করতে হয়, 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখো। ৫

উত্তর -

৩. জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে লেখক কী পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন - তা 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখো। ৫

উত্তর ঃ

৪. "বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে।" -কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? কবিত্ব সাধনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের সাধনার কী মিল লেখক লক্ষ্য করেছেন, তা আলোচনা করো। ২+৩=৫

উত্তর ঃ

৫. আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'কবিতা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা প্রবন্ধটি অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও।

উত্তর ঃ

*****

একক – ২ (গদ্য)

অন্নদাদিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

লেখক-পরিচিতি

বাংলার কালজয়ী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। ভাগলপুরের মামার বাড়িতে তিনি প্রতিপালিত হন এবং বাল্যকালে সেখান থেকেই পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুর থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেবানন্দ গ্রামে ফিরে আসেন।

তারপর হুগলির ব্রাঞ্চ স্কুলে কিছুকাল পড়াশোনা করার পর শরৎচন্দ্র স্থানান্তরিত হন ভাগলপুরে। সেখানেই ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি First Arts অর্থাৎ IA ক্লাসে পড়েন। তবে অর্থাভাবে তাকে পড়াশোনার ইতি টানতে হয়। অবশেষে ১৯০৩ সালে তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানেই তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প। তারপর 'বড়দিদি' উপন্যাস লিখে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও গল্পগুলো হল - 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'দত্তা', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনাপাওনা', 'বিপ্রদাস', 'শ্রীকান্ত' (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ পর্ব), 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শেষপ্রশ্ন', 'পথের দাবী' ইত্যাদি।

গল্প - 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'মেজদিদি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'নিষ্কৃতি', 'হরিলক্ষ্মী' ইত্যাদি।

নাটক - 'ষোড়শী', 'রমা', 'বিজয়া'।

প্রবন্ধ - 'নারীর মূল্য', 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য'।

চারটি পর্বে রচিত 'শ্রীকান্ত' তাঁর জীবনালেখ্যও বলা চলে। 'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাই বিট্রিশ সরকার তাঁর এই উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব সম্পদ। বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ধারা বহমান। অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষদের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতিই তাঁর রচনার উৎস। শরৎচন্দ্রের রচনায় বাস্তবজীবনের কথাই স্থান পেয়েছে বেশি। তাঁর সামাজিক লেখনীগুলোতে বর্তমান সমাজব্যবস্থার অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের ভুমিকা তিনি গ্রহণ করেননি। নর-নারীর গভীর হৃদয় রহস্যকে তিনি তাঁর দৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সাধনার পুরস্কার স্বরূপ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিনী সুবর্ণপদক' লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানিত ডি.লিট. উপাধি পান। এছাড়া তিনি সাহিত্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ই জানুয়ারি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। পাঠকের মনের মনিকোঠায় তিনি অমর, কথাসাহিত্যিক।

উৎস

'অন্নদাদিদি' শীর্ষক গদ্যাংশটি অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এর প্রথম পর্বের পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে সংকলিত হয়েছে।

বিষয়সংক্ষেপ

শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' এর প্রথম পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি অংশ বিশেষ 'অন্নদাদিদি'। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় উপনীত হয়ে শ্রীকান্ত কৈশোরের ফেলে আসার দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করেছেন। ইন্দ্রনাথের উষ্ণ সান্নিধ্যে উজ্জ্বল মধুর দিনগুলোর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় শ্রীকান্তের জীবন দর্শনের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ এক আলোকসামাণ্য ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল চরিত্র। সে দুঃসাহসী নির্ভীক, পরোপকারী জীবনের যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সহজ ভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসায় তার প্রতি শ্রীকান্তের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে।

অন্নদাদিদির স্বামী শাহজী অবাঙালি মুসলমান সাপুড়ে সেজে সাপ খেলিয়ে ও বুজরুকি চাল দেখিয়ে লোক ঠকায় এবং নেশা-গাঁজা খায়। ইন্দ্র সাপুড়ে বিদ্যার নানা অলৌকিক তন্ত্রমন্ত্র শেখার দুর্বার আকর্ষণে শাহজীর কাছে বার বার ছুটে আসে। শাহজীকে সে ওস্তাদ বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। এ কারণে সাপের একটা বিষপাথর সংগ্রহ করার জন্য অর্থ জোগাড় করে সে শাহজীকে অনেক টাকা দিয়েছে।

অন্নদাদিদি ইন্দ্র ও শ্রীকান্তকে ছোটো ভাইয়ের মতো স্নেহ-যত্ন করত। তাই সরল প্রাণ ইন্দ্রের প্রতি তার স্বামীর এই ভন্ডামি অন্নদাদিদিকে আহত করে। তাই সে নিজের জীবনের সবচেয়ে গোপনীয় অথচ সত্য কথা প্রকাশ করে এবং শাহজীর লোক ঠকানোর ব্যবসার কথা ইন্দ্রকে জানিয়ে দেয়। এতে ইন্দ্রের সর্পবিদ্যা শেখার দীর্ঘদিনের ইচ্ছের মোহভঙ্গ হয়। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রনাথ বিশ্বাসভঙ্গের তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় তাদের, জোচ্চোর বলে গালাগাল করতে থাকে।

আবার সত্য প্রকাশ করায় ক্রুদ্ধ শাহজী অন্নদাদিদিকে শারীরিক নির্যাতন করলে ইন্দ্রই দিদিকে রক্ষা করতে ছুটে আসে। মল্লযুদ্ধে শাহজীকে পরাস্ত করে তার হাত বেঁধে রাখে এবং দিদির শুশ্রুষা করে। এক সময় সুস্থ হয়ে অন্নদাদিদি স্বামীর বাঁধন খুলে দেয় এবং ইন্দ্রকে কঠিন শপথ করতে বাধ্য করে। সে যেন কখনো আর তাদের বাড়িতে না আসে। সরলপ্রাণ ইন্দ্রনাথ বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্র অভিযোগ জানিয়ে জলভরা চোখে শ্রীকান্তকে নিয়ে ফিরে আসে। দিদির এই মহান আত্মত্যাগের কথা শ্রীকান্ত কিশোর বয়সে সঠিকভাবে বোধগম্য না হলেও পরবর্তী সময়ে একটু বেশী করেই উপলব্ধি করেছিল।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

শিহরিয়া = কম্পিত হওয়া, কেঁপে উঠা; অসংকোচে = সঙ্কোচ না করে, খেয়াল = চেতনা, নিদ্রিত= ঘুমন্ত, আশ্চর্য = বিস্মিত, আড়চোখে = বাঁকা দৃষ্টিতে, নীরবে = নিঃশব্দে, ভোগা = হয়রানি, ভোগান্তি; সস্নেহে = স্নেহের সাথে, খোশামোদ = খুশি করার জন্য প্রশংসা, তিরস্কার = ভৎর্সনা, আদায় = সংগ্রহ, ভয়ানক = অতিশয় ভয়ংকর, সহসা = হঠাৎ, ডালা = সাপের ঝাঁপি, এখানে সাপ রাখার ঢাকনা বিশেষ; সভ্রম = মান, সম্মান; ছোবল = সাপের কামড়, সহিত = সঙ্গে, সপ্রতিভ = প্রতিভান্বিত, বুদ্ধিসম্পন্ন; ওস্তাদ = গুরু, ফস করে = হঠাৎ দ্রুততার সথে, খিলখিল = হাসির শব্দ, কোঁচা = ধুতির ভাঁজ করা সামনের ভাগ, নিবিড় = ঘন, গভীর; আট-ঘাট = চারিদিক, বিদ্যুৎ-দীপ্তি = বিদ্যুতের আলো, তক্ষুণি = সেইমাত্র, মিলাইয়া = মিলিয়ে যাওয়া, বিষ-পাথর = প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সাপের বিষ টেনে নেয় যে পাথর, উত্তেজিত = অশান্ত, বরঞ্চ = পক্ষান্তরে, প্রতীক্ষা = অপেক্ষা, গোলাম = ভৃত্য, চাকর; ক্ষুন্ন অভিমান = স্বল্প অপমানবোধ হওয়া,

পট্টি দিয়ে = ধাপ্পাবাজি করে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি = যে দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা প্রকাশ পায়, নিঃশব্দে = চুপচাপ, শব্দহীন; অপরিসীম = সীমাহীন, নতমুখে = মাথা নিচু করে, কালিবর্ণ = কালো রং, সর্বাগ্রে = সবার আগে, পরক্ষণেই = একটু সময় পরেই, ম্লাণভাবে = দুঃখিত মনে, শীর্ণ = কৃশ, ক্ষীন; ঝাপসা = যা পরিষ্কার নয়, শুষ্ক ওষ্ঠাধারে = নীরস ঠোঁটে, অস্ফুট কিরণরেখা = অস্পষ্ট আলোর রেখা, মন্তর = মন্ত্র, ঘনবিন্যস্ত ডাল = ঘনভাবে ছড়ানো ডাল, গাঢ় অন্ধকার = গভীর বা ঘন অন্ধকার, অভাবনীয় কান্ড = ভাবা যায় না এমন বিষয়, আগাগোড়া = প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় = হতবুদ্ধি, ফাঁকি = ধোঁকা, প্রবঞ্চণা; দ্বার = দরজা, ফ্যালফ্যাল = বিমূঢ়ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, তন্ত্রমন্ত্র = সাধনা সংক্রান্ত, শ্লোকবিশেষ, প্রকৃতিস্থ = স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত, অত্যল্পকাল = অত্যন্ত অল্প সময়ে, ধোঁকা দিয়ে = ঠকিয়ে, ফাঁকি দিয়ে, অসংশয়ে = নিঃসন্দেহে, জবাব = উত্তর, ঘনিষ্ঠ = অতি নিকটস্থ, স্তব্দ = শব্দহীন, ক্রুদ্ধ = রাগান্বিত, কৌশল = কায়দা, এলোমেলো = অবিন্যস্ত, আগোছালো; জোচ্চুরি = জুয়াচুরি, সুমুখে = সামনের দিকে, তৎক্ষনাৎ = সঙ্গে সঙ্গে, দেরী না করে; নিরুত্তর = উত্তর না দেওয়া, ভ্রূক্ষেপ = গ্রাহ্য করা, কর্কশকণ্ঠে = রুক্ষ ভাষায়, ঠগ = প্রতারক, অগ্রসর = আগে বা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, অদূরে = যা বেশি দূরে নয়, নিকটস্থ; কণ্ঠস্বর = গলার আওয়াজ, কেরোসিনের ডিপা = কেরোসিন রাখার ছোট পাত্রবিশেষ, প্রত্যুত্তর = উত্তরের প্রেক্ষিতে জবাব, সভয়ে = ভয়ের সঙ্গে, কয়েক পদ = কয়েক পা, মুহূর্ত = ক্ষণিকের সময়, অগ্রসর = এগিয়ে যাওয়া, অকস্মাৎ = হঠাৎ, বিলম্ব = দেরী, নিবিড় = ঘন, চোখের পলকে = চোখের নিমেষে, তীব্র আর্তস্বর = জোরালো কাতর চিৎকার, ভূমিসাৎ = মাটির সঙ্গে মিশে গেছে এমন, ছোঁ মারিয়া = হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নেবার চেষ্টা, গোলমালে = গন্ডগোলে, অদৃষ্ট = কপালের লিখন, চাবকে = চাবুক মেরে, শিয়াফুল গাছ = শেয়ালকাঁটা গাছ, বদমাস = দুষ্ট ব্যক্তি বিশেষ, ঝাড় = ঝোঁপজঙ্গল, অশিষ্ট ইঙ্গিত = অভদ্র সংকেত বা ইশারা, সবেগে = তীব্র বেগে, সর্বাঙ্গ = সারা শরীর, ক্ষতবিক্ষত = আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, রোজগার = উপার্জন, প্রাঙ্গন = উঠোন, ইহকাল = জীবিতকাল, একপ্রান্তে = একপাশে, পরকাল = মৃত্যুর পরবর্তী সময় বা কাল, মূর্ছিত = অচেতন, হিসেব নিকেশ = জমা-খরচের পঞ্জীকরণ, মল্ল যুদ্ধ = হাতাহাতি লড়াই, কুস্তি; শিহরিয়া = রোমাঞ্চিত হয়ে, তীক্ষ্ণধার = যা অত্যন্ত ধারালো, নিমেষ = পলকহীন, বলবান = শক্তিমান, স্পষ্ট = প্রকাশিত, দুঃসাহস = অতিশয় সাহসী, লিপিবদ্ধ = লিখে রাখা, টানা-হেচড়া = জোরাজুরি, জোর করে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা, গাঁজাখোর = যে গাজার নেশায় বুদ থাকে, আস্তিন = জামার হাতা, গ্রহণ = প্রাপ্তি, স্বীকার, অজস্র রক্তস্রাব = অত্যধিক রক্তক্ষরণ, দ্বিধা = সংশয়, পরন্তু = পক্ষান্তরে, উদ্ভট = আজগুবি, কম্পিতহস্তে = কাঁপা কাঁপা হাতে, কল্পনা = মনগড়া, মুমূর্ষু = মরণাপন্ন, উপহাস = ঠাট্টা,

ব্যঙ্গ করা, বিষাক্ত = বিষযুক্ত, ইতস্তত = এখানে সেখানে, সংকোচ; সর্প = সাপ, অভিজ্ঞতা = পান্ডিত্য, প্রতিবাদ = বিরুদ্ধে উক্তি, অতিক্রম = পার হওয়া, অচৈতন্য = অজ্ঞান, কৈফিয়ৎ = জবাব, নেমক হারাম = অকৃতজ্ঞ, দিব্যি = শপথ, স্বচ্ছন্দে = আরামে, অনায়াসে; বিবরণ = বর্ণনা, বল্লম = বর্শা, শপথ = প্রতিজ্ঞা, বিহ্বল = আত্মহারা, অলক্ষ্যে = দৃষ্টির অগোচরে, অপয়া = কুলক্ষনযুক্ত, লক্ষ্মীহীন; হিঁদু = হিন্দু, নির্জন = নিরালা, জনমাবনহীন; নচ্ছার = পাজি, অপদার্থ, ফ্যাসাদ = ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা; ব্যথিত = পীড়িত, দুঃখিত।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : মান -১

১. 'অন্নদাদিদি' পাঠ্যাংশের লেখক কে?

উত্তর - 'অন্নদাদিদি' পাঠ্যাংশের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২. 'অন্নদাদিদি' শীর্ষক গদ্যাংশটি কোন্ মূলগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর - 'অন্নদাদিদি' শীর্ষক গদ্যাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'-এর প্রথম পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩. শরৎচন্দ্র কোন্ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন?

উত্তর - শরৎচন্দ্র 'অনিলা দেবী' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

৪. সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে শুনতে কে হঠাৎ বার-দুই শিহরে উঠলেন?

উত্তর - সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে শুনতে ইন্দ্রের দিদি অন্নদা হঠাৎ বার-দুই শিহরে উঠলেন।

৫. 'সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম।' - 'সে' ও 'আমি' কে?

উত্তর - 'সে' হল ইন্দ্রনাথ এবং 'আমি' বলতে শ্রীকান্তকে বোঝানো হয়েছে।

৬. 'সে আশ্চর্য হইয়া যাইত' - 'সে' কে?

উত্তর - সে হল ইন্দ্রনাথ।

৭. 'ছি দাদা, এমন কাজ আর কখ্খনো করে না।'

- কে, কাকে এই উক্তিটি করেছে? কাজটি কি?

উত্তর - অন্নদাদিদি ইন্দ্রকে এই উক্তিটি করেছে। কাজটি হল সাপ নিয়ে খেলা করা।

৮. 'এসব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই।'

- কোন্ ভয়ানক জানোয়ারের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর - সাপ নামক ভয়ানক জানোয়ারের কথা বলা হয়েছে।

৯. সাপটি কোথায় ছোবল মেরেছিল?
উত্তর - সাপটি ইন্দ্রের হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল।

১০. 'আমি কি তেমনি বোকা দিদি' - বক্তা কে?
উত্তর - বক্তা ইন্দ্রনাথ।

১১. 'আট ঘাট বেঁধে রেখেছি কিনা' - বক্তা এখানে কি বোঝাতে চেয়েছে?
উত্তর - বক্তা ইন্দ্রনাথ সাপ যাতে কামড়াতে না পারে তার জন্য যে একটা গাছের শিকড় কোমরে বেঁধে রেখেছে, এখানে তারই কথা বলা হয়েছে।

১২. বিষ পাথর কী?
উত্তর - বিষপাথর বলতে এমন এক পাথরকে বোঝায়, যার সাহায্যে সাপের বিষ টেনে বের করা হয়।

১৩. 'আজ দাও না দিদি আমাকে একটি।' - বক্তা কার কাছে, কি চেয়েছে?
উত্তর - বক্তা ইন্দ্রনাথ তার দিদি অন্নদার কাছে একটি বিষপাথর চেয়েছিল।

১৪. কার মুখখানি অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেল?
উত্তর - অন্নদাদিদির মুখখানি অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেল।

১৫. শাহজী ইন্দ্রকে কীসের মন্ত্র দিয়েছিল?
উত্তর - শাহজী ইন্দ্রনাথকে শুধু হাতচালার মন্ত্র দিয়েছিল।

১৬. 'ওকে আর আমি খোশামোদ করবি নে দিদি' - কে, কাকে খোশামোদ করবে না?
উত্তর - আলোচ্য উক্তিটির বক্তা ইন্দ্রনাথ, সাপুড়ে শাহজিকে আর খোশামোদ করবে না।

১৭. 'তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাকব' - বক্তা কেন একথা বলেছে?
উত্তর - অন্নদাদিদি ও শাহজি যদি ইন্দ্রনাথকে তাদের সমস্ত বিদ্যা দান করে, তাহলে ইন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদের গোলাম হয়ে থাকার কথা বলেছে।

১৮. 'কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি' - কে, কী টের পেয়েছে?
উত্তর - ইন্দ্রনাথ টের পেয়েছে যে, অন্নদাদিদিও শাহজির মতো তন্ত্রমন্ত্র বিদ্যায় সর্বজ্ঞ।

১৯. 'এত বড়ো ওস্তাদ উনি' - কে কার সম্পর্কে একথা বলেছে?
উত্তর - বক্তা ইন্দ্রনাথ সাপুড়ে শাহজী সম্পর্কে একথা বলেছে।

২০. 'সে কি মধুর হাসি' - মধুর হাসিটি কার?
উত্তর - মধুর হাসিটি অন্নদাদিদির।

নিজে করো ঃ **মান-১**

২১. 'এ বিদ্যে কি কেউ শিগ্‌গির দিতে চায় দিদি।' - কোন্ বিদ্যার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর -

২২. 'এমনি মন্তরের জোর।' - এখানে কোন্ মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর -

২৩. ' তোর দিদির এসব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই।' - কে কাকে একথা বলেছে?
উত্তর -

২৪. 'একটি কথাও অবিশ্বাস করব না' - বক্তা কার, কোন্ কথা অবিশ্বাস করবে না?
উত্তর -

২৫. 'আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি।' - বক্তা কে?
উত্তর -

২৬. 'তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে।' - এখানে 'তোমরা' কারা?
উত্তর -

২৭. 'আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি।' - 'আমাদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
উত্তর -

২৮. 'এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না।' - ইন্দ্র কি পারিল না?
উত্তর -

২৯. 'ঠগ জোচ্চোর সব।' - কথাটি কে কার উদ্দেশ্যে বলেছিল?
উত্তর -

৩০. কার মুখখানি একবারে মড়ার মত সাদা হয়ে গেল?
উত্তর -

৩১. 'আমরা যে সাপুড়ে।' - সাপুড়ে কাদের বলে?
উত্তর -

৩২. শ্রীকান্ত কার জন্য কত টাকা এনেছিল?
উত্তর -

৩৩. গোলমালে কার নেশার ঘুম ভেঙ্গে গেল?
উত্তর -

৩৪. শাহজী কীসের জোরে মড়া বাঁচায় বলে প্রচার করে?
উত্তর -

৩৫. 'শাহজী চমকাইয়া উঠিল' - শাহজীর চমকে উঠার কারণ কি?
উত্তর -

৩৬. 'তাহাকে এই প্রথম বাংলা বলিতে শুনিলাম।' - কে, এই প্রথম কার বাংলা বলা শুনল?
উত্তর -

৩৭. 'ওই বললে, তোমার কানাকড়ির বিদ্যে নাই।' - এখানে 'ওই' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
উত্তর -

৩৮. 'দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন' - দিদি কী বলেছিলেন?
উত্তর -

৩৯. "প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না।" - কার, কোন্ প্রশ্ন?
উত্তর -

৪০. "কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল।" - কার এই উক্তি?
উত্তর -

৪১. শ্রীকান্তের সর্বাঙ্গ কোন্ গাছের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হল?

উত্তর -

৪২. "গুরুশিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে।" -এখানে গুরুশিষ্য কে?
উত্তর -

৪৩. 'এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না।' - কোন্ সংবাদের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর -

৪৪. কে বাধা না দিলে হয়তো সে যাত্রা শাহজির সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হয়ে যেত?
উত্তর -

৪৫. কার অবস্থা দেখে শ্রীকান্ত ভয়ে কেঁদেছিল?
উত্তর -

৪৬. ইন্দ্রকে শাহজী কী দিয়ে আঘাত করেছিল?
উত্তর -

৪৭. 'তাহা দিয়ে অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।' - কোথা দিয়ে অজস্র রক্তস্রাব হচ্ছে?
উত্তর -

৪৮. শাহজী অদূরে বসে কীসের দৃষ্টি দিয়ে নিঃশব্দে চেয়ে দেখতে লাগল?
উত্তর -

৪৯. 'তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন করতে পারো।' -কে কাকে একথা বলেছে?
উত্তর -

৫০. ইন্দ্র শাহজীর হাত বেঁধেছিল কেন?
উত্তর -

৫১. শাহজীকে বন্ধনমুক্ত করে কে?
উত্তর -

৫২. কীসের আঘাতে দিদি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল?
উত্তর -

৫৩. 'ও খুন করতে পারে।' - কার সম্পর্কে কার এই উক্তি?
উত্তর -

৫৪. দিদির কখন জ্ঞান ফিরেছিল?
উত্তর -

৫৫. সংসার চালানোর জন্য অন্নদাদিদি কী বিক্রি করত?
উত্তর -

৫৬. ইন্দ্রনাথ কার টাকা চুরি করে শাহজিকে দিয়েছিলেন?
উত্তর -

৫৭. 'আর কখনো এ বাড়িতে আসিস্‌নে।' - কে কাকে একথা বলেছে?
উত্তর -

৫৮. 'ইন্দ্র প্রথমটা অবাক হয়ে গেল' - ইন্দ্র অবাক হল কেন?
উত্তর -

৫৯. 'একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিল না।' - কে কার কথার প্রতিবাদ করল না?
উত্তর -

৬০. 'হারামজাদা নচ্ছার' - কে কার উদ্দেশ্যে একথা বলেছে?
উত্তর -

৬১. 'সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।' - কে কাঁদছিল?
উত্তর -

৬২. ইন্দ্রনাথের ক্ষতস্থান শ্রীকান্ত কী দিয়ে বেঁধেছিল?
উত্তর -

৬৩. কোন্ পথ দিয়ে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ ফিরে আসছিল?
উত্তর -

৬৪. নৌকা ঘাটে এসে লাগল কখন?
উত্তর -

৬৫. 'তুই বড়ো অপয়া!' - কে, কাকে অপয়া বলেছে?
উত্তর -

৬৬. 'আজ থেকে তোকে আর আমি কোনো কাজে ডাকব না।'
- বক্তা কাকে একথা বলেছে?
উত্তর -

৬৭. 'বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।' - কে, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল?
উত্তর -

৬৮. কে নিঃশব্দে নৌকা বাইতে লাগলো?
উত্তর -

৬৯. শ্রীকান্ত বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হয়ে কোথায় একাকী দাঁড়িয়ে রইল?
উত্তর -

৭০. 'অন্নদাদিদি' পাঠ্যাংশটি কার জবানীতে লিখিত?
উত্তর -

৭১. শিয়াকুল গাছের কাঁটা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে শ্রীকান্তের কত সময় লেগেছিল?
উত্তর -

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ **মান - ৩**

১. "এত বড়ো ওস্তাদ উনি!"- কে, কাকে, কার সম্বন্ধে এ কথা বলেছে? তাকে 'বড়ো ওস্তাদ' বলার কারণ কী?

উত্তর - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অন্নদাদিদি' পাঠ্যাংশে ইন্দ্র শ্রীকান্তকে শাহজী সম্বন্ধে এ কথা বলেছে।

শাহজী একজন সাপুড়ে। সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখানো, সাপের বিষ ঝাড়া ইত্যাদি কাজে সে খুব দক্ষ। অন্ধবিশ্বাসের কারণে শাহজিকে ইন্দ্রনাথ গুরুতুল্য মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। শাহজীর কাছ থেকে হাত-চালা, কড়ি-চালা, ঘরবন্ধন, দেহবন্ধন বা ধুলো-পড়ার মতো অসম্ভব সব বিদ্যার কথা ইন্দ্রনাথ শুনেছে। এমনকী সে এও শুনেছে যে, শাহজী মন্ত্রবলে মড়া মানুষও বাঁচাতে সক্ষম। ইন্দ্রনাথের মতে শাহজী তিন দিনের বাসিমড়াকেও নাকি মাত্র আধঘন্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেন। তাই ইন্দ্র শাহজীকে 'বড়ো ওস্তাদ' বলেছেন।

২. "এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না।" - কার, কোন্ সংবাদ জানা ছিল না?

উত্তর - কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস থেকে নেওয়া 'অন্নদাদিদি' নামক পাঠ্যাংশ থেকে উদ্ধৃতাংশটি গৃহীত হয়েছে। ইন্দ্র যে শাহজী অপেক্ষা কতখানি বলবান, সে সংবাদ শাহজির জানা ছিল না।

অন্নদাদিদিকে শাহজীর প্রহারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইন্দ্র শাহজীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে শাহজী আচমকা ইন্দ্রকে সাপ মারার তীক্ষ্ণধার বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরে আহত করেছিল। কিন্তু এর পরক্ষণেই ইন্দ্র শাহজীকে এর উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাটিতে চিত করে ফেলে তার বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরেছিল। ইন্দ্রের সেই জোড় এতটাই ছিল যে, শ্রীকান্ত যদি ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রনাথকে নিরস্ত না করত তাহলে শাহজীর মৃত্যু একপ্রকার অনিবার্য ছিল। ইন্দ্রনাথের এই ধরনের আচরণে শাহজী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল যে, ইন্দ্রনাথ তার অপেক্ষা অধিক বলবান ছিল।

নিজে করো ঃ (মান - ৩)

৩. "তুই বড়ো অপয়া।" - বক্তা কে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অপয়া বলার কারণ কী?
উত্তর ঃ

৪. "তোর দিদির এসব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই।"
- কে, কাকে একথা বলেছে? এখানে কোন্ বিদ্যার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর ঃ

৫. 'আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি।' - কে, কাকে একথা বলেছে? উক্তিটির কারণ কী?
উত্তর ঃ

৬. 'সে কি মধুর হাসি' - এখানে কার মধুর হাসির কথা বলা হয়েছে? হাসির কারণ কি ছিল?
উত্তর ঃ

৭. 'কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল।' - কার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটল? তার অদৃষ্টে কী ঘটেছিল?
উত্তর ঃ

৮. 'সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।'
- সে কে? কেন সে কাঁদছে? বক্তা সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করার কারণ কী?
উত্তর ঃ

৯. 'এমনি মন্তরের জোর।' - কোন্ মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে? সেই মন্ত্রের জোর কেমন ছিল?
উত্তর ঃ

১০. 'আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের এক্কেবারে গোলাম হয়ে থাকব।'- উদ্ধৃতাংশে বক্তার মানসিকতার পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **মান -৫**

১. "আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

- উদ্ধৃতাংশে 'আমি' কে? মন্তব্যটি স্বপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো। ১+৪=৫

উত্তর - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গল্পাংশে 'আমি' বলতে শ্রীকান্তের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের বন্ধু। ইন্দ্রের কথা অনুসারে বাড়িতে কাউকে না বলে চুপিসারে রাতের অন্ধকারে ইন্দ্রের সঙ্গে তার দিদির বাড়ি যায়। সেখানে পৌঁছে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় সে। দিদি কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে দেয় যে, ইন্দ্রনাথ শুধু শুধু মিথ্যা আশা নিয়ে মন্ত্র সংগ্রহের জন্য শাহজীর পিছন পিছন ঘুরছে। এগুলো সবকিছুই মানুষকে ঠকানোর ব্যবসা মাত্র। একথা শুনে, একদিকে দীর্ঘদিনের আশাভঙ্গ অন্যদিকে তাদের জন্য টাকা অপচয়ে ইন্দ্র উত্তেজিত হয়ে শাহজীকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। শাহজী ইন্দ্রের কাছ থেকে জানতে পারে শাহজীর স্ত্রী অন্নদা অর্থাৎ ইন্দ্রের দিদিই তাকে একথা বলেছে। শাহজী তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠির আঘাতে মূর্ছিত করে অন্নদাকে। দিদিকে বাঁচাতে গিয়ে ইন্দ্রও অল্পবিস্তর শাহজীর হাতে আহত হয়। অবশেষে দিদির থেকেও তীব্র অপমান পেয়ে প্রায় শেষ রাতে নৌকা করে তাদের গন্তব্যে এসে

পৌঁছে। শ্রীকান্তকে নৌকা থেকে নামিয়ে ইন্দ্র তাকে জানায় যে, শ্রীকান্তের জন্যই ইন্দ্র বিপদে পড়েছে। তাই আর কখনো তাকে সঙ্গে নেবে না। শ্রীকান্ত অপয়া। এইকথা বলে ইন্দ্র দ্রুতগতিতে নদীর গভীর জলে নৌকা ঠেলে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়। বর্ণিত এই ঘটনার জন্য শ্রীকান্ত দুঃখভরা মনে নীরবে জনহীন নদীতীরে একাকী দাঁড়িয়ে রইল।

নিজে করো ঃ (মান - ৫)

২. 'এত বড় ওস্তাদ উনি।' - আলোচ্য উক্তিটির বক্তা কে? বক্তা কার সম্পর্কে কাকে এই উক্তিটি করেছে? আলোচ্য পাঠ্যাংশে ওস্তাদ ব্যক্তির পরিচয় দাও। ১+১+৩=৫

উত্তর ঃ

৩. "তাঁর মুখখানি কীসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল।" - আলোচ্য উক্তিটির বক্তা কে? - কার কোন্ কথায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মুখ কালিবর্ণ হয়ে গেল? ১+৪=৫

উত্তর ঃ

৪. 'দিদি চুপ করিয়া রহিলেন - একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না।'- দিদির বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ ছিল? দিদি সে অভিযোগের প্রতিবাদ করলেন না কেন? ২+৩=৫

উত্তর ঃ

৫. 'অন্নদাদিদি' গদ্যাংশ অবলম্বনে ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। ৫

উত্তর ঃ

৬. "গুরুশিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে।" - বক্তা কে? গুরু ও শিষ্যের নাম কী? মল্লযুদ্ধের পরিস্থিতি বর্ণনা করো।

উত্তর ঃ

৭. 'অন্নদাদিদি' গদ্যাংশ অবলম্বনে শ্রীকান্ত চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
উত্তর ঃ

৮. "সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না!" - বক্তা কে এবং কার সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে?- কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা এই কথা বলেছে? ১+৪=৫
উত্তর ঃ

৯. "প্রতিপদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।" - এটি কার ভাবনা? কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা হয়েছে? ১+৪=৫
উত্তর ঃ

*****

একক – ২ (গদ্য)

যুগজিজ্ঞাসা

অন্নদাশঙ্কর রায়

লেখক-পরিচিতি ঃ (১৯০৪ - ২০০২)

পরাধীন ভারতবর্ষের আই.সি.এস. এবং স্বাধীন ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ ওড়িশার ঢেঙ্কানলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নিমাই চরণ রায়। তিনি ঢেঙ্কানল রাজস্টেটের কর্মচারী ছিলেন। মা ছিলেন হেমনলিনী। অন্নদাশঙ্কর পেশায় আমলা হলেও শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, সমকালীন বিচিত্র সমস্যা তাঁকে আন্দোলিত করত এবং এসব বিষয়ে কলম ধরে তাঁর প্রতিভা ও মনীষাকে তুলে ধরতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি একাধারে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি, প্রগতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, অবিস্মরণীয় ছড়াকার, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক।

ঢেঙ্কানলেই তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। কটকের র‍্যাভেনস কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি খরচে আই.সি.এস. হতে বিলেত যান। এ সময়ে তাঁর ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনি 'পথে প্রবাসে' বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ 'তারুণ্য' (১৯২৮ খ্রিঃ), প্রথম কবিতার বই 'রাখী' (১৯২৯ খ্রিঃ) এবং প্রথম উপন্যাস 'আগুন নিয়ে খেলা' ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত

হয়। তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন কন্যা অ্যালিস ভার্জিনিয়া অনফোর্ডকে বিয়ে করেন এবং নাম দেন লীলা রায়। অন্নদাশঙ্করের অনেক লেখা 'লীলাময়' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম এপিক উপন্যাস 'সত্যাসত্য'।

তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনাবলী হল - 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২), অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩), কলঙ্কবতী (১৯৩৪), দুঃখমোচন (১৯৩৬) ইত্যাদি উপন্যাস। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ - 'রাখী বসন্ত' (১৯৩২), 'কামনা পঞ্চবিংশতি' (১৯৩৪), 'কালের শাসন' (১৯৩৩), 'নূতনা রাধা' (১৯৪৩) প্রভৃতি। তাছাড়া তাঁর লেখা কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ হল - 'তারুণ্য' (১৯২৮), 'জীবন শিল্পী' (১৯৪১), 'ইশারা' (১৯৪৩), 'জীয়ন কাঠি' (১৯৪৯), 'কণ্ঠস্বর' প্রভৃতি। তাছাড়া তাঁর ভ্রমণ কাহিনি ও অসংখ্য ছোটগল্প রয়েছে যা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনি হল 'জাপানে'। এই গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'আকাদেমি পুরস্কার' পান। এছাড়াও তিনি নানা সাহিত্যকর্মের জন্য 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার', 'দেশিকোত্তম পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার'সহ আরো অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি ৮৩ বছর বয়সে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

উৎস গ্রন্থ

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটি তাঁর 'কণ্ঠস্বর' প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা। 'কণ্ঠস্বর' প্রবন্ধ গ্রন্থে মোট ৩২ টি প্রবন্ধ রয়েছে।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

যুগজিজ্ঞাসা = যুগ সম্বন্ধে বিশেষ জানার যে আগ্রহ তা, নস্যাৎ = বাতিল, মোকাবিলা = সামনাসামনি বোঝাপড়া, বকেয়া = বাকি, প্রবল = খুব, খোঁচায় = আঘাত, অতীতানুরাগ = অতীতের প্রতি অনুরাগ, অনাদর = অবহেলা, সম্বন্ধ = সংযোগ, মিল; দুরাশা = যে আশা মেটানো কষ্টকর, উপেক্ষা = অনাদর, পাত্তা না দেওয়া; গোঁজামিল = যথার্থ মিলের অভাব, অগ্রাহ্য = গ্রহণ করা যায়না এমন, বর্জনীয়; সম্যক ধারণা = যথার্থবোধ, সমন্বয় = সংগতি, মিল; মারণাস্ত্র = মারার জন্যে নির্মিত অস্ত্র, দৃঢ় = শক্ত, কঠিন; পণ্ডশ্রম = বৃথা চেষ্টা, স্বরূপ = নিজস্বরূপ, অভিন্ন = একই, ভিন্ন নয়; বোধ = চেতনা, জ্ঞান; নিঃশেষ = শেষ পর্যন্ত, অনুসন্ধিৎসা = খোঁজ, অনুসন্ধান করার ইচ্ছা; শরিক = অংশীদার,

হিউম্যানিজম = মানবিকতা, হ্যামলেট = শেক্সপীয়রের সৃষ্ট একটি নাটকের চরিত্র, দৈবলিখন = ভাগ্য নির্ধারিত, প্রতিকার = প্রতিবিধান, সনাতন = নিত্য, চিরস্থায়ী; স্বার্থদুষ্ট = স্বার্থের দ্বারা কলঙ্কিত, সংস্কার = বহুকালের অভ্যাসজাত মনে ধারণা এবং প্রবৃত্তি, বদ্ধমূল = দৃঢ়মূল, ব্যর্থ = বিফল, স্বাধিকার = নিজ অধিকার, পরম্পরা = ধারাবাহিকতা, বহমান = যা প্রবাহিত হচ্ছে এমন, ফরমাস = হুকুম, আজ্ঞা; আপত্তি = অসম্মতি, কায়িক = দৈহিক, শারীরিক, নিষ্পত্তি = প্রতিকার, নিষ্ফলা = ফলহীনা, বন্ধ্যা; বন্ধ্যা = উৎপাদনহীন, সৃষ্টিহীন; আত্মিক = আত্মার বিষয় সম্পর্কিত, বিকৃতি = কুৎসিত ভঙ্গি, কদাকার; দুরূহ = কঠিন, অতিক্রম = পার হওয়া, নিকৃষ্ট = নীচুমানের, নগদ বিদায় = কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়, দুর্দিন = অশুভ সময়, আপশোস = ক্ষোভ, দুঃখ; হস্তক্ষেপ = হাত দেওয়া, কোনো কাজে বাধা দেওয়া; ঘাত = আঘাত, প্রতিঘাত = আঘাতের বদলে আঘাত, সংস্কার মুক্তি = বহুকালের ধারণা বা বিশ্বাস থেকে মুক্তি, ভাবীকাল = আগামী সময়, ভবিষ্যৎকাল; পরমায়ু = দীর্ঘজীবন।

বিষয় সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিক, ছড়াকার অন্নদাশংকর রায় তাঁর 'কণ্ঠস্বর' গ্রন্থের অন্তর্গত 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের সূচনাতেও বলেছেন যে, আমরা ভারতীয়রা পরাধীনতার সময় দেশকে, দেশের স্বাধীনতাকে প্রধান্য দিতে গিয়ে যুগকে অবহেলা করেছি। এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি। তাই এখন আমাদের যুগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রাবন্ধিকের মতে, গত শতাব্দীতে মনীষীদের মধ্যে যুগজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কোন মহাপুরুষই দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগকে অবহেলা করেননি। কিন্তু প্রাবন্ধিকের মতে, ঐ শতাব্দীর শেষদিকে উলটো হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। যেমন দেশের অনুরাগ হয়ে উঠল দেশের অতীতের প্রতি অনুরাগ। অথচ সেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোন সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন প্রাবন্ধিক। লেখকের মতে, এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই ভারতকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আর সেই জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে একটা যোগসূত্র রাখা দরকার।

অনেকে প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। কিন্তু এর অর্থ হল গোঁজামিল। কেননা অতীত ভারত সম্বন্ধে আমাদের কারোরই দৃঢ় ধারণা

নেই। তখন ভারতে দেবতা যেমন অসুরও ছিল, কৌরব যেমন ছিল পান্ডবও ছিল। আস্তিক দর্শনের সাথে নাস্তিক দর্শনও ছিল। প্রাচীন ভারতের স্বরূপটা ছিল অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মত। সেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করছে। তাই তাকে যেমন জীবন থেকে উৎপন্ন বলে পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায়না ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক বলে প্রাচীন ভারতকেও আকাশে তুলে দেওয়া যায়না। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন - "আকাশের সঙ্গে পাতালকে একসূত্রে গাঁথা যায় না"। ভারতকে এইসকল ভাবনা ত্যাগ করে পুরোপুরি আধুনিক যুগের সাথে অভিন্ন হতে হবে। লেখকের মতে, এই আধুনিক বিশ্বের শরিক কেবল ইউরোপ বা আমেরিকাই নয়, এর অংশীদার ভারতীয়রাও। আমাদের আচার, সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্যগুলোকে আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে আমরা প্রাচীন ভারতের ভূত নয় বরং আধুনিক ভারতের জীবন্ত মানুষ। আর আধুনিক যুগের জীবন্ত মানুষের মতো ভারতীয়দের একটা সৃষ্টিশীল ভূমিকা থাকবে, সেখানে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোও থাকতে হবে।

প্রাবন্ধিকের মতে, "এ যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, মানবিকতার যুগ"। লেখক যুগটিকে 'হিউম্যানিজম' বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেখানে সমাজ, সম্প্রদায়, শ্রেণি, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো। আগেকার দিনে 'দৈবলিখন' বলে নারী, শুদ্র, ক্রীতদাসকে ছোট করে রাখা হত। আর এই সুযোগ নিয়ে শ্রেণিপতিরা যা প্রতিকারযোগ্য ছিল তাকে দৈব লিখনের নাম দিয়ে এবং যা কৃত্রিম ছিল তাকে স্বাভাবিক বলে চালু করে দিয়েছিল। বদ্ধমূল সংস্কারকে চালানো হয়েছে নীতি আদর্শ বলে আর সত্য বলে চালানো হয়েছিল যা স্বার্থ দুষ্ট।

লেখকের মতে এই সকল শোষণ পীড়ণের যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপের নবজাগরণের সময় থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে শুরু হয় বিদ্রোহ। আর এই বিদ্রোহটা শুধু ইউরোপের, কেবল এই ধারণার কোনো ব্যাপার নেই। লেখকের মতে - "ওটা সর্বমানবের"। ভারতের অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনও ছিল সর্বমানবের জন্য। এই সকল বিদ্রোহ আস্তে আস্তে আধুনিক রূপ নিয়েছে। কারণ কেউ জাতপাতের দরুণ, লিঙ্গের দরুণ, রঙের দরুণ পিছিয়ে পড়ে থাকতে চায়না। প্রত্যেকে যেকোনো উপায়ে এই পরাধীনতা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। লেখক এর দুটি উপায়ের কথা বলেছেন। একটি হল শ্রেষ্ঠ উপায় অর্থাৎ বন্ধুত্ব বা অহিংসা আর আরেকটি নিকৃষ্ট উপায় হল যুদ্ধ। কারণ সবকিছুর আসল উদ্দেশ্যই হল নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। তাই লেখক বলেছেন - "উদ্দেশ্য হল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা"।

প্রাবন্ধিক বলেছেন শুধু স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সময় ব্যয় করলে চলবেনা। নতুন-নতুন সৃষ্টির কাজও আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। গায়ক, বাদক, নর্তক, ছবিকার কিংবা কবি প্রত্যেকেই প্রতিদিন যে যার সৃষ্টিধর্মী কাজ করে যেতে হবে। এসব কাজ একদিনও বন্ধ রাখা চলবেনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এইসকল কাজ করতে গিয়ে শিল্পীদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিল্পীদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করতে দেওয়া হচ্ছে না। সকল দেশেই বর্তমান শতাব্দীতে এমন কিছু লোক দলপতি হয়ে বসে আছে যারা শিল্পীদের বাধা দিচ্ছে। ফলে নতুন কিছুই তেমন সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই প্রাবন্ধিক বলছেন - "শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত।" আর যখন নতুন কিছুই সৃষ্টি হচ্ছে না তখন পরবর্তীকালে দেখা যাবে আমাদের পরে যে প্রজন্ম আসবে তারা তখন আমাদের যুগটাকে নিষ্ফলা, বন্ধ্যা বলবে।

নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যা করার তা করলেও একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পীদেরও শুধু দৈহিকভাবে নয় 'আত্মিক অর্থে' বেঁচে থাকা প্রয়োজন। শিল্পীরা যদি তাদের অন্তর দিয়ে সৃষ্টিধর্মী কাজ করতে না পারে, "তাহলে তেমন বাঁচার কী তাৎপর্য!" প্রাবন্ধিকের মতে, শিল্পীরা যুগের মধ্য দিয়ে কাজ করলেও তারা কিন্তু 'নিত্যকালের রাখাল'। যুগ যদি শিল্পীদের বিকৃতি ঘটায় সেটা যুগেরই মুখবিকৃতি হবে। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হাসির পাত্র হবে।

যুগের মধ্য দিয়ে শিল্পীসহ সকলকেই যেতে হবে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্পীর পরমায়ু যুগের চেয়েও দীর্ঘ। তবে শিল্পীর সাধনাও যুগকে পার করবার মতোই কঠিন। তবে যারা অর্থের বিনিময়ে কাজ করে তাদের কথা আলাদা। তারা আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে। কিন্তু যারা সকল সময়েই বর্তমান অর্থাৎ আজ, কাল ও চিরকাল বর্তমান আছেন তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে তারা কী লিখছে, কী আঁকছে, কী দিচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে থাকার জন্য প্রাবন্ধিক বলেছেন। কারণ প্রাবন্ধিকের মতে - "তাদের সৃষ্টির মধ্যে, তোমরাও বাঁচবে"।

সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় সবদেশেই শিল্পীদের বিপদ লক্ষ্য করেছেন। তিনি তার জন্য যুগকেই দায়ী করেন। তবে এর সাথে সাথে তিনি হুঁশিয়ারী দিয়ে এও বললেন যে এ যুগ যদি শিল্পীদের সহ্য না করে তাহলে দুঃখের সীমা থাকবেনা। কারণ এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, ঘাত-প্রতিঘাতময়, বহুবর্ণ চরিত্রসংবলিত ও বিপুল পরিমাণ সংস্কারমুক্তির যুগতো শিল্প সৃষ্টির জন্য আদর্শ।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **মান - ১**

১. 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?

উত্তর - 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটির রচয়িতা হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

২. 'খুকু' কে?

উত্তর - খুকু লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের তৈরি একটি কাল্পনিক চরিত্র।

৩. খুকুকে কী জিজ্ঞাসা করা হয়? এবং উত্তরে সে কী বলল?

উত্তর - খুকুকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে মা ও বাবার মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসে। উত্তরে খুকু বলল - "মাকেও, বাবাকেও"। অর্থাৎ মা-বাবা দুজনকেই সে ভালোবাসে।

৪. লেখক কাকে বেশি ভালোবাসেন বলেছেন?

উত্তর - লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় যুগ ও দেশ উভয়কেই ভালোবাসেন।

৫. আমরা কীসের প্রতি এতোদিন মনোযোগ দিতে পারিনি?

উত্তর - আমরা যুগের প্রতি এতোদিন মনোযোগ দিতে পারিনি।

৬. অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে এতোদিন দেশ কী অবস্থায় ছিল?

উত্তর - এতোদিন দেশ পরাধীন অবস্থায় ছিল।

৭. দেশ পরাধীন ছিল বলে আমরা কীসের প্রতি মনোযোগ দিইনি?

উত্তর - দেশ পরাধীন ছিল বলে আমরা যুগের প্রতি মনোযোগ দিইনি।

৮. আমরা কখন দিনরাত দেশের কথাই ভেবেছি?

উত্তর - দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন আমরা দিনরাত দেশের কথাই ভেবেছি।

৯. আমরা কী এক খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছি?

উত্তর - আধুনিককে পাশ্চাত্য বলে আমরা এক খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছি।

১০. "ঐ কাজটি বকেয়া পড়ে রয়েছে" - কোন্ কাজটির কথা বলা হয়েছে?

উত্তর - যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করার কাজটির কথা বলা হয়েছে।

১১. এখন কার সাথে কেন মোকাবিলা করা দরকার?

উত্তর - দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে এখন যুগের সাথে মোকাবিলা করা দরকার।

১২. 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে উল্লিখিত গতশতাব্দীর নায়ক কারা?

উত্তর - গত শতাব্দীর নায়ক হলেন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ।

১৩. কারা, কাকে অনাদর করেন নি?

উত্তর - রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকে দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগকে অনাদর করেন নি।

১৪. কখন উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে?

উত্তর - গতশতাব্দীর শেষভাগে উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে।

১৫. কীসের মধ্যে সেতু বন্ধনের আশা দুরাশা?

উত্তর - প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্ব-এর মধ্যে সেতু বন্ধনের আশা দুরাশা।

১৬. প্রাবন্ধিকের মতে, কাকে নিয়ে ঘর করা যায়না?

উত্তর - প্রাবন্ধিকের মতে, ভুতকে নিয়ে ঘর করা যায়না।

১৭. গতশতাব্দীর নায়কদের মধ্যে কী প্রবল ছিল?

উত্তর - গতশতাব্দীর নায়কদের মধ্যে যুগজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল।

১৮. "তার থেকে এল সেতু বন্ধনের কথা" - কী থেকে সেতু বন্ধনের কথা এসেছে?

উত্তর - ভূতকে নিয়ে যে ঘর করা যায়না, তা থেকে সেতুবন্ধনের কথা এসেছে।

১৯. প্রাবন্ধিক কার মাঝে একটি সেতু নির্মাণ করার কথা বলেছেন?

উত্তর - প্রাবন্ধিক প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্বের মাঝখানে সেতু নির্মাণ করার কথা বলেছেন।

২০. 'তার মানে গোঁজামিল' - উক্তিটি কোন্ রচনার অন্তর্গত?

উত্তর - উক্তিটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'যুগজিজ্ঞাসা' শীর্ষক রচনার অংশ।

২১. লেখকের মতে প্রাচীন ভারতের স্বরূপ কেমন?

উত্তর - লেখকের মতে প্রাচীন ভারতের স্বরূপ অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মতো।

২২. প্রাচীন ভারতে ভয়ংকর মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় কীসের থেকে?

উত্তর - প্রাচীন ভারতে ভয়ংকর মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় দানব ও অতি ভয়ংকর মারণাস্ত্র থেকে।

নিজে করো ঃ (মান - ১)

২৩. 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে লেখক কাদের একসূত্রে গাঁথা যায়না বলেছেন?

উত্তর -

২৪. প্রাচীন ভারত কী নিঃশেষে ভোগ করেছে?

উত্তর -

২৫. 'একথা সকলে জানে।' - কোন্ কথা সকলে জানে?

অথবা এই যুগকে কীসের যুগ বলে সকলে জানে?

উত্তর -

২৬. "কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা" - তার চেয়েও বড়ো কথা কী?

উত্তর -

২৭. আমরা প্রাচীন ভারতের কী নই?

উত্তর -

২৮. এযুগ কীসের যুগ?

উত্তর -

২৯. 'যাকে বলে হিউম্যানিজম' - হিউম্যানিজম মানে কী? অথবা এর লক্ষণগুলো কী কী?

উত্তর -

৩০. 'যেন সেটা তাদের দৈবলিখন।' - দৈবলিখন কী? অথবা এখানে তাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর -

৩১. আগেকার দিনে নৈতিক বলে কাকে চালানো হয়েছে?

উত্তর -

৩২. সত্য বলে আগেকার দিনে কাকে চালানো হয়েছে?

উত্তর -

৩৩. লেখকের মতে কখন বিদ্রোহ শুরু হয়?

উত্তর -

৩৪. বিদ্রোহটা কাদের?

উত্তর -

৩৫. বিদ্রোহটা ক্রমান্বয়ে কীসের রূপ নিয়েছে?

উত্তর -

৩৬. এ যুগে কী সাফ করার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর -

৩৭. প্রাবন্ধিকের মতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্টতম উপায় কী?

উত্তর -

৩৮. 'এসব কাজ একদিনও ফেলে রাখা যায় না' - কোন্ কাজের কথা বলা হয়েছে? অথবা ফেলে রাখলে কী হবে বলে লেখক মনে করেন?

উত্তর -

৩৯. সৃষ্টির কাজ ফেলে রাখলে কী শুকিয়ে যাবে?

উত্তর -

৪০. নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো কোন্ প্রক্রিয়া নিত্য বহমান?

উত্তর -

৪১. লেখকের মতে কেমন ধরণের লোকেরা বর্তমান শতাব্দীতে সব দেশেই দলপতি হয়ে বসে আছে?

উত্তর -

৪২. শিল্পীর দুর্দিনের জন্য লেখক কাকে দায়ী করেন?

উত্তর -

৪৩. শিল্পীরা কীসের মধ্যে বাঁচে?

উত্তর -

৪৪. আধুনিক যুগে কাদের বেঁচে থাকা শক্ত?

উত্তর -

৪৫. "পরবর্তী যুগের ওরা বলবে" - কখন পরবর্তী যুগের ওরা কী বলবে?

উত্তর -

৪৬. লেখকের মতে অমৃতের সন্তান কারা?

উত্তর -

৪৭. "কিন্তু তারা নিত্যকালের রাখাল" - কারা নিত্যকালের রাখাল?

উত্তর -

৪৮. 'তারা আজ আছে কাল নেই' - কারা আজ আছে, কাল নেই?

উত্তর -

৪৯. এ যুগ শিল্পীদের সহ্য না হলে, কী হবে?

উত্তর -

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **মান - ৩**

১. 'শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত' - কোন্ রচনার অংশ? আধুনিক যুগে শিল্পীদের পক্ষে বেঁচে থাকা শক্ত কেন?

উত্তর - আলোচ্য উক্তিটি বিখ্যাত প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'যুগজিজ্ঞাসা' রচনার অংশ।

প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যাতে সৃষ্টিশীল কাজ তথা শিল্প কর্ম যেন বন্ধ না হয়। বর্তমান যুগ আধুনিকতার যুগ। আবার বলা হয় বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা এ যুগ মানবিকতার যুগ। কিন্তু প্রকৃত শিল্পীরা কোনো যুগেই আবদ্ধ নন। তাঁরা সবসময় সর্বমানবের উদ্দেশ্যেই নিজেদের অনুভূতি বাদ্য-চিত্র-নৃত্য-বাক্য ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ ঘটান স্বাধীনভাবে।

কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজের কিছু কর্তা ব্যক্তি তাদের নিজেদের ফরমাস অনুযায়ী শিল্পীদের কাজ করার জন্য বাধ্য করছেন। এতে করে শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারছেনা। এতে করে শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে

শিল্পের রস, রূপ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হচ্ছেনা। এ কারণেই লেখক বলেছেন - "শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত"।

২. 'যাকে বলে হিউম্যানিজম'

- হিউম্যানিজম কথার অর্থ কী? হিউম্যানিজম এর লক্ষণগুলো কী কী?

উত্তর - প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ব্যবহৃত হিউম্যানিজম কথাটির অর্থ হল 'মানবিকতা'।

প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল এ যুগ মানবিকতার যুগ। আর এই যুগের কিছু নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের কথা তিনি বলেছেন। এযুগের লক্ষণগুলো সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন - এক্ষেত্রে সমাজ, শ্রেণি, সম্প্রদায় বা সংঘের চেয়ে মানুষকে বড়ো করে দেখা হয়। অর্থাৎ মানবধর্মকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সমাজের তৈরি করা কোনো নিয়ম নীতিতে ব্যক্তিস্বার্থ যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই যুগ অনেকটাই সংস্কার মুক্ত।

নিজে করো ঃ

৩. 'ঐ কাজটা বকেয়া পড়ে রয়েছে'

- কোন্ কাজটির কথা বলা হয়েছে? কাজটি বকেয়া পড়ে আছে কেন? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৪. 'প্রাচীন ভারতের স্বরূপ অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মতো।'

- কোন্ রচনার অন্তর্গত? প্রাচীন ভারতের স্বরূপ কেমন ছিল? ১+২=৩

উত্তর ঃ

৫. "অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে।"
- কোন্ রচনার অন্তর্গত? উক্তিটির তাৎপর্য লেখো। ১+২=৩
উত্তর ঃ

৬. 'ভূতকে নিয়ে ঘর করা যায়না'
- লেখক কোন্ রচনাতে কেন এধরনের উক্তি করেছেন তা লেখো। ৩
উত্তর ঃ

৭. "আকাশের সঙ্গে পাতালকে একসূত্রে গাঁথা যায়না।"
- এখানে আকাশ ও পাতাল বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কেন তাদের একসূত্রে গাঁথা যায়না বলে লেখক মনে করেন? ১+২=৩
উত্তর ঃ

৮. "ভারতীয়দের অহিংস সত্যাগ্রহ সর্বমানবের"
- অহিংস সত্যাগ্রহ কী? লেখকের এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২=৩
উত্তর ঃ

৯. 'তারা নিত্যকালের রাখাল'

- তারা কারা? তাদের নিত্যকালের রাখাল বলার তাৎপর্য কী? ১+২=৩

উত্তর ঃ

১০. "তা হলে আপশোসের সীমা থাকবেনা।"

- কী হলে আপশোসের সীমা থাকবেনা? মন্তব্যটির তাৎপর্য লেখো। ১+২=৩

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **মান - ৫**

১. "পরবর্তী যুগে ওরা বলবে এযুগ নিষ্ফলা, বন্ধ্যা"

- কোন্ রচনার অন্তর্গত? লেখকের এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+৪=৫

উত্তর - আলোচ্য উদ্ধৃতিটি প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'কণ্ঠস্বর' গ্রন্থের 'যুগজিজ্ঞাসা' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত।

প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে শিল্পীদের সৃষ্টিশীল কাব্যের ধারাকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো নিত্য বহমান বলেছেন। আর এই বহমান ধারা ব্যাহত হলে তার পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক এই উক্তি করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে শিল্পীদের সৃষ্টি করতে করতে বাঁচতে হবে। সৃষ্টির কাজ একদিনও বন্ধ রাখা যাবেনা। কিন্তু দেখা যায় যে অধিকাংশ রাষ্ট্র প্রধানরা শিল্পকে করায়ত্ত করতে, সেই সাথে শিল্পীদেরও নিজেদের ফরমাস মতো লিখতে, আঁকতে, গাইতে, বাজাতে, নাচতে বাধ্য করে। এরফলে শিল্পের নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে। কারণ শিল্পীর সৃষ্টির উপর কারো জোর খাটেনা। কারণ ফরমাসে আর সবকিছু হলেও শিল্পের

রূপ, রস, সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়না। ফলে এযুগ যখন অতীত হয়ে যাবে তখন প্রকৃত শিল্পসম্পদ রেখে যাবেনা। আর তখনই পরবর্তী যুগের 'ওরা' (মানুষেরা) বলবে "এ যুগ নিষ্ফলা, বন্ধ্যা"। এই সকল কারণেই প্রাবন্ধিক উপরিউক্ত উক্তিটি করেছেন।

নিজে করো ঃ

২. 'যুগজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো। ৫

উত্তর -

৩. 'ওই কাজটা বকেয়া পড়ে রয়েছে'

- কোন্ রচনার অন্তর্গত? কোন্ কাজটি বকেয়া পড়ে রয়েছে? আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক কী করার পরামর্শ দিয়েছেন লেখো। ১+১+৩=৫

উত্তর -

৪. "অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে।"

- কোন্ রচনার অন্তর্গত? 'জমে থাকা পাপ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? পাপকে কীভাবে সাফ করা যাবে বলে লেখক মনে করেন? ১+১+৩=৫

উত্তর -

৫. "কিন্তু আধুনিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা চাই।"

- লাইনটি কোথা থেকে গৃহীত হয়েছে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ১+২+২=৫

উত্তর -

*****

একক – ৩ (ছোটোগল্প)

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০)

লেখক পরিচিতি

১৮৮০ খ্রিঃ ১৬ মার্চ বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে রাজশেখর বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর গ্রামে। পিতার নাম চন্দ্রশেখর বসু এবং মাতা লক্ষ্মীমনি দেবী। শৈশব কাটে দ্বারভাঙ্গায়। ছোটবেলায় তিনি ফটিক নামে পরিচিত ছিলেন।

প্রথম জীবন থেকেই তিনি বিজ্ঞানকে ভালোবাসতেন। ১৮৮৮-১৮৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গা স্কুলে পড়েন এবং সেখান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ খ্রিঃ পাটনা কলেজ থেকে পাস করেন। ১৮৯৯ খ্রিঃ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম বিভাগে এম এ পাস করেন। ১৯০২ খ্রিঃ রিপন কলেজ থেকে বি. এ. ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সাথে ১৯০৩ খ্রিঃ বেঙ্গল কেমিক্যালে কর্মজীবন শুরু করেন। ক্রমে বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার ও সেক্রেটারি হন। ১৯৩৩ খ্রিঃ স্বাস্থ্য অবনতির কারণে পদ থেকে অবসর নেন। কিন্তু এরপরেও আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি।

রাজশেখর বসু সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করেন ১৯৯২ খ্রিঃ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। ভারতবর্ষ, প্রবাসী পত্রিকায় কখনো স্বনামে, কখনো 'পরশুরাম,' 'উপরিচর বসু' ছদ্মনামে বিভিন্ন ধরনের লেখা লেখেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশিত হয় এবং পরে তা 'গড্ডালিকা' গল্প গ্রন্থে স্থান পায়। পরবর্তী জীবনে

পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি সাহিত্য সাধনা ও মননশীল প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন।

রাজশেখর বসুর রচনাবলীকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় -

অ) অভিধান মূলক গ্রন্থ ঃ- 'চলন্তিকা'।

আ) অনুবাদ গ্রন্থ ঃ- 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'মেঘদূত' ইত্যাদি।

ই) প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ- 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা', 'কুটির শিল্প' ইত্যাদি।

ঈ) গল্পগ্রন্থ ঃ- 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'গল্পকল্প, 'ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প', 'হিতোপদেশের গল্প,' 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প', নীলতারা ইত্যাদি গল্প' 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প'।

উ) কবিতা ঃ- 'প্রার্থনা', 'দেবনির্মাণ', 'ঘাস', চন্দ্র, 'সূর্যবন্দনা', 'দুলালের গল্প' 'জামাইবাবু ও বৌমা', 'সতী, 'পুতুলের বিবাহ'।

সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৪০ খ্রিঃ 'সরোজিনী পদকে' ভূষিত হন। ১৯৫৫ খ্রিঃ রবীন্দ্রপুরস্কার পান 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' গ্রন্থের জন্য। ভারত সরকার ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজশেখর বসুকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন। ১৯৫৫ খ্রিঃ রবীন্দ্রপুরস্কার পান 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' গ্রন্থের জন্য। ১৯৫৭ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট এবং ১৯৫৮ খ্রিঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি পান। 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৮ খ্রিঃ একাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল রাজশেখর বসু পরলোকগমন করেন।

উৎস গ্রন্থ

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ১৯২২ সালে পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসুর রচিত প্রথম ছোটগল্প। গল্পটি 'গড্ডালিকা' গল্পসংকলন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সারাংশ

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জগতে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' পরশুরামের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। বাংলাদেশে যৌথ ব্যবসায়ীর মধ্যে যে শঠতা, মিথ্যাচার ও প্রতারণা আমাদের সমাজ জীবনকে কৌলুষিত করেছে তারই নিখুঁত চিত্র এই গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন। ধর্মের নামে ভণ্ডামী, জোচ্চুরি ও বঞ্চনার কথাই ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে পরশুরাম তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত করেছেন।

গল্পের নায়ক শ্যামলাল গাঙ্গুলি ধর্মীয় সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে শ্যালক বিপিনকে সঙ্গী করে জুডাস লেনে কোম্পানীর নামে এক নতুন অফিস স্থাপন করেন। স্ত্রী নিস্তারিনী দেবীর মালিকানাভুক্ত জমিতে জাগ্রত দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা এবং এটিকে একটি পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করাই এই কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য। মন্দির তৈরি হবে শেয়ার হোল্ডারদের টাকায়। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা। এক লক্ষ শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ করা হবে। তাছাড়া জাগ্রত দেবীর মন্দিরে প্রচুর ভক্ত সমাগম হবে। দর্শনী ও প্রণামী ছাড়া প্রতারকরা আরও নানা উপায়ে অর্থাগমের পরিকল্পনা করেছে। ফলে কোম্পানীর লাভের অংশ বিপুল পরিমাণ ধারণ করবে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে আশাতীত দক্ষিণা, অর্থ ও মোক্ষ লাভের লোভ দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করাই ভন্ড ধার্মিক শ্যামলালের এই ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য। আর এই কোম্পানী গড়ে তোলার সঙ্গী হিসেবে যাদের ডিরেক্টর করলেন, তারা হলো– (১) শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, (২) শ্রীযুক্ত গান্ডেরিরাম বাটপারিয়া, ধুরন্দর ব্যবসাদার, (৩) শ্রীযুক্ত অটল বিহারী দত্ত, সলিসিটার্স, (৪) মি: বিপিন চৌধুরী B.Sc, Ass (U.S.A), (৫) শ্রীমৎ শ্যামানন্দ কালী সাধক ও ব্রহ্মচারী।

কোম্পানীর বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হবে এবং ১০০ পারসেন্ট ডিভেডেন্ট দেওয়া হবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পেলে অ্যালটমেন্ট হবে। কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচার লোক ঠকানো ব্যবসার যে প্রতিবাদী চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক তা সত্যিই আধুনিক যুগের পরিস্থিতির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কোনো অর্থলগ্নি ছাড়াই সবাই কৌশলে মোটা টাকার শেয়ারের হিসেব কাগজপত্রে রেখেই কোম্পানীর কর্ণধার হয়ে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেন। দেড় বছর পর কোম্পানীর নব্বই হাজার টাকা দেনা। শ্যামবাবু এবার ব্যবসা ছেড়ে কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের চরণে ঠাঁই নেবার সিদ্ধান্ত নেন। আর বৃদ্ধ তিনকড়ি বাবু কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে এক হাজার টাকা পারিশ্রমিকের লোভে ফাঁদে পা দিয়ে শ্যামবাবুর সমস্ত শেয়ার কিনে চূড়ান্তভাবে ঠকেছেন।

এই গল্পে আসলে সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে কাজ লাগিয়ে এক শ্রেণির অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, চতুর ও অসাধু ব্যবসায়ীর চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে পরশুরাম বাস্তব জীবনের এক জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

আরমানি = আর্মেনিয়া জাতীয়, গির্জা = খ্রিষ্টানদের উপাসনাস্থল, ক্রমাগত - বারবার, লোলচর্ম = ঝোলা চামড়া, প্রলেপ = লেপন, কেশ = চুল, পশ্চাতে = পিছনে, আপিস = অফিস, বিস্তৃত = প্রসারিত, তাম্বুলরাগচর্চিত = পানের দাগ, নোটিস = বিজ্ঞপ্তি, লম্বিত = দোলায়িত; ঝোলানো; কতিপয় = কতকগুলো, অহিংসা = হিংসা বা দ্বেষ নেই এমন, ইতস্তত = চারিদিকে, স্বচ্ছন্দে = অনায়াসে, বিচরণ = ঘুরে বেড়ানো, নিঃশঙ্ক = ভয়হীন, অন্তরালবর্তী = আড়ালে থাকা, নির্লিপ্ত = উদাসীন, ব্যতিব্যস্ত = বিব্রত, দিনযাপন = দিন কাটানো, কাষ্ঠফলক = কাঠের বোর্ড, হিঙ্= একপ্রকার রান্নার মশলা, সরঞ্জাম = জিনিসপত্র, মাদুলি = তাবিজ, কবচ; নিদর্শন = চিহ্ন, শ্যামবর্ণ = শ্যামলা রংয়ের, আকণ্ঠলম্বিত = গলা পর্যন্ত লম্বা, পেটেন্ট = স্বত্ব; নকল রোধের সরকার স্বীকৃত অধিকার, লোমশ বপু = লোমওয়ালা শরীর, ধর্মভীরু = ধর্মের প্রতি ভয়, দক্ষিণাবর্ত = দক্ষিণ দিকে পাক খাওয়া, গৈরিক = গেরুয়া, অনুরক্ত = অনুরাগ, ভস্ম = ছাই, দেরাজ = ড্রয়ার, গঙ্গোদক = গঙ্গার জল, সন্দিগ্ধ = সন্দেহযুক্ত, কঞ্জুস - কৃপণ, মাকড়ি = কানের অলংকার বিশেষ, ডিভিডেন্ট = লাভের অংশ, মুসাবিদা - খসড়া, মেমোরান্ডম = স্মারকলিপি, লভ্য = লাভ, উদবৃত্ত = বাকী, দৈনিক = প্রত্যহ, প্রতিদিন; ভিখ = ভিক্ষা, রক্তাম্বর = লাল রং-এর পোষাক, ছুছুন্দর = ইঁদুর, উৎকৃষ্ট = উন্নতমানের, হাওলাতি = বাকী, বয়েল = সিদ্ধ, বন্দোবস্ত = ব্যবস্থা, বকড়ি = ছাগল, মুনাফা = লাভ, নাতিবৃহৎ = যা খুব বেশি বড় নয়, বুজরুক = প্রতারক, সাব্যস্ত = বিবেচিত, সুনিশ্চিত, প্রমাণিত; প্রত্যাগত = ফিরে আসা, আলোয়ান = চাদর, ডেবিট = খরচ, ক্রেডিট = জমা, ছোকরা = ছেলে, আস্পর্ধা = দুঃসাহস, ধৃষ্টতা; বরদাস্ত = সহ্য, কার্যসিদ্ধি = কার্যে ফলপ্রাপ্তি, সুপক্ক কদলী = পাকা কলা, ব্রাদার-ইন-ল = শ্যালক, মরসুম = সুবিধাকালীন সময়, অজ্ঞাতপূর্ব = যা আগে অজানা, মোতাবেক = অনুযায়ী, অন্তরায় = বাধা, মতলব = উদ্দেশ্য, যৎকিঞ্চিৎ = অতি সামান্য, সন্তর্পনে = ধীরে ধীরে, হামবগ = আমিই বড়ো, দিলদরিয়া = উদারহৃদয়, ঝাক্কি = ঝুঁকি, পঙ্গু = বিকলাঙ্গ, লেফাফা = খাম, তকলিফ = কষ্ট, দুরন্ত = সংশোধিত, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ = বুড়ো আঙ্গুল, মাসোহারা = মাসিক বেতন, সঞ্চালন = নাড়াচাড়া।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও

১) সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পের লেখক কে?

উত্তর ঃ- সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পের লেখক 'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু)।

২) পরশুরামের আসল নাম কী?

উত্তর ঃ- পরশুরামের আসল নাম রাজশেখর বসু।

৩) রাজশেখর বসুর প্রথম ছোটগল্পের নাম কী?

উত্তর ঃ- রাজশেখর বসুর প্রথম ছোটগল্পের নাম 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'।

৪) 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামক ছোটগল্পটি কোন্ গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ- 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' রাজশেখর বসু রচিত 'গড্ডালিকা' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৫) আলোচ্য গল্পের শুরুতে কোন্ সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর ঃ- আলোচ্য গল্পটিতে মাঘ মাসের ১৩২৬ সালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬) গল্পের প্রধান চরিত্র কে?

উত্তর ঃ- গল্পের প্রধান চরিত্র শ্যামলাল গাঙ্গুলি।

৭) শ্যামবাবুর কোম্পানির নাম কী?

উত্তর ঃ- শ্যামবাবুর কোম্পানির নাম 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনাল মার্চেন্টস'।

৮) আরমানি গির্জার ঘড়িতে কয়টা বাজার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ- আরমানি গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারোটা বাজার কথা বলা হয়েছে।

৯) শ্যামবাবুর আপিসটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ঃ- শ্যামবাবুর আপিসটি কলকাতার জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে অবস্থিত।

১০) 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল এর স্বত্বাধিকারী কে?

উত্তর ঃ- ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল এর স্বত্বাধিকারী হলেন শ্যামবাবু ও তার শ্যালক বিপিন চৌধুরী।

১১) হিঙের গন্ধ কোথা থেকে আসছিল?

উত্তর ঃ- সিন্ধি পরিবারের রান্নাঘর থেকে হিঙের গন্ধ আসছিল।

১২) শ্যামবাবুর বয়স কত?

উত্তর ঃ- শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

১৩) শ্যামবাবু কীসের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন?

উত্তর ঃ- ই বি রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকুরির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

১৪) শ্যামবাবুর এককালীন কীসের কারবার ছিল?

উত্তর ঃ- এককালে শ্যামবাবুর পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার ছিল।

১৫) অল্পবয়স থেকে শ্যামবাবুর কীসের প্রতি ঝোঁক ছিল।

উত্তর ঃ- অল্পবয়স থেকে শ্যামবাবুর স্বাধীন ব্যবসার প্রতি ঝোঁক ছিল।

১৬) 'কিন্তু তাহার আয় সামান্য' - কীসের আয় সামান্য?

উত্তর ঃ- শ্যামবাবুর দেশে যে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি ও একটি কালী মন্দির আছে, সেখানকার আয় সামান্য।

১৭) ব্যবসার কাজে শ্যামবাবুর প্রধান সহায়ক কে?

উত্তর ঃ- ব্যবসার কাজে শ্যামবাবুর প্রধান সহায়ক হলেন তাঁর শ্যালক বিপিন চৌধুরী।

১৮) শ্যামবাবু অবসর মতো কীসের সাধনা করেন?

উত্তর ঃ- শ্যামবাবু অবসরমতো তান্ত্রিক সাধনা করেন।

১৯) 'অকারণে কারণ পান করেন না'। - কারণ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ- 'কারণ' শব্দের অর্থ হল মদ্য বা মদ।

২০) শ্যামবাবুর অফিসের বেয়ারার নাম কি?

উত্তর ঃ- শ্যামবাবুর অফিসের বেয়ারার নাম বাঞ্ছা।

২১) শ্যামবাবু নিজেকে কী বলে পরিচিতি দেন?

উত্তর ঃ- শ্যামবাবু নিজেকে শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী হিসেবে পরিচিতি দেন।

২২) সিঁদুর চর্চিত রাবার স্ট্যাম্পে কী খোদাই করা ছিল?

উত্তর ঃ- সিঁদুর চর্চিত রাবার স্ট্যাম্পে ১২ লাইন শ্রী শ্রী দুর্গা নাম খোদাই করা ছিল।

২৩) বিপিন আবিষ্কৃত শ্রমহারক যন্ত্রটির নাম কি?

উত্তর ঃ- বিপিন আবিষ্কৃত শ্রমহারক যন্ত্রটির নাম 'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ'।

নিজে করো ঃ

মান-১

২৪) অটলবাবু কোন প্রতিষ্ঠানের জুনিয়ার পার্টনার?

উত্তর ঃ-

২৫) 'বুড়ো রাজি হল' - উদ্ধৃতাংশে 'বুড়ো' কে?

উত্তর ঃ-

২৬) বিপিনের বাল্যবন্ধু কে ছিলেন?

উত্তর ঃ-

২৭) অটলবাবুর পেশা কি?

উত্তর ঃ-

২৮) শরতের খুড়শ্বশুরের নাম কী?

উত্তর ঃ-

২৯) তিনকড়ি বাবু কত হাজার টাকার শেয়ার নিতে রাজি হয়েছেন?

উত্তর ঃ-

৩০) শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের মূলধন কত ছিল?

উত্তর ঃ-

৩১) শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের প্রসপেক্টসটা কে লিখেছেন?

উত্তর ঃ-

৩২) সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের অনুষ্ঠানপত্রের প্রথমে কী লেখা আছে?

উত্তর ঃ-

৩৩) ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে কীসের উপকার হতে পারে?

উত্তর ঃ-

৩৪) সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড কোন্ ধরনের কোম্পানি?

উত্তর ঃ-

৩৫) সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের ডিরেক্টর কয়জন ছিলেন?

উত্তর ঃ-

৩৬) 'তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন' - সাধারণে কী জানে না?

উত্তর ঃ-

৩৭) বিপিনের নতুন টাইটেলটি কী?

উত্তর ঃ-

৩৮) নতুন টাইটেল পেতে বিপিনবাবুর কত খরচ হয়েছে?

উত্তর ঃ-

৩৯) 'ভেক বিনা ভিখ মেলে না'। - বক্তা কে?

উত্তর ঃ-

৪০) গল্পে উল্লেখিত সিদ্ধেশ্বরী দেবী মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ঃ-

৪১) শ্যামবাবুর স্ত্রী এর নাম কী?

উত্তর ঃ-

৪২) দেবীমন্দির ও তার নিকটবর্তী দেবত্ব সম্পত্তির মালিক কে?

উত্তর ঃ-

৪৩) 'কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে।' - কোম্পানি কী সম্পন্ন করবে?

উত্তর ঃ-

৪৪) আপাতত কত হাজার যাত্রীর জন্য অতিথিশালা নির্মিত হবে?

উত্তর ঃ-

৪৫) ঘই কী?

উত্তর ঃ-

৪৬) রায়সাহেব তিনকড়িবাবুর বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ-

৪৭) তিনকড়িবাবুর বয়স কত?

উত্তর ঃ-

৪৮) 'দেখুন স্বামীজি, হিসেবই হল ব্যবসার সব' - বক্তা কে?

উত্তর ঃ-

৪৯) ঘৃতের দ্বারা কীসের শৈত্য গুণ দূর হয়?

উত্তর ঃ-

৫০) তিনকড়িবাবু কাজের জন্য কেমন লোক চান?

উত্তর ঃ-

৫১) কার ভবিষ্যতবাণী সফল হয়েছে? ভবিষ্যতবাণীটি কি ছিল?

উত্তর ঃ-

৫২) কীসের জোরে সমস্ত শেয়ার বিলি হয়ে গিয়েছে?

উত্তর ঃ-

৫৩) 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার ইন-ল' কোম্পানির সভাপতির নাম কী?

উত্তর ঃ-

৫৪) 'ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে।' - সভা কোথায় বসেছে?

উত্তর ঃ-

৫৫) শ্যামবাবু কত টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন?

উত্তর ঃ-

৫৬) গল্পাংশে খোট্টা বলে কাকে ডাকা হয়েছে?

উত্তর ঃ-

৫৭) 'আমি আর পয়সাও দিচ্ছি না।' - উক্তিটির বক্তা কে?

উত্তর ঃ-

৫৮) 'মানুষ ভাবে এক হয় আর এক' - উক্তিটি কার?

উত্তর ঃ-

৫৯) 'লোকটা দোষে গুণে মানুষ' - উদ্ধৃতাংশে লোকটি কে?

উত্তর ঃ-

৬০) শেষপর্যন্ত লিমিটেড কোম্পনির কত টাকা দেনা হয়েছে?

উত্তর ঃ-

৬১) 'তবে আমরা এখন উঠি' - 'আমরা' কে?

উত্তর ঃ-

রচণাধর্মী প্রশ্ন ঃ **মান- ৫**

১. 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে জোচ্চুরি ব্যবসার প্রতি যে তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে গল্পটি অবলম্বনে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ- ছোটগল্পকার রাজশেখর বসু পরশুরাম ছদ্মনামে রচিত 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে 'ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার ইন ল,' ব্যবসার নামে আমাদের দেশে যে জোচ্চুরি ব্যবসা হয় তার প্রতি তীব্র নিন্দা করেছেন।

এই গল্পে কোম্পানির মালিক শ্যামবাবু ও তার শ্যালক বিপিন চৌধুরী মিলে ধনী হওয়ার আশায় আরও কয়েকজনের সহায়তার ধর্মকেন্দ্রিক যৌথ ব্যবসা স্থাপনে জোচ্চুরির পথ অবলম্বন করেছেন। শ্যামবাবু ই. বি রেলওয়ে অফিসের চাকরির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। দেশে তার কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি ও জীর্ণ কালীমন্দির আছে, যার আয় খুব সামাণ্য। তাই চাকরির অবসরে শ্যামবাবু ব্যবসা করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করেন। স্বভাবে তিনি ভন্ড, লোভী। তাই মানুষকে ঠকাতে ও পরের অর্থ আত্মসাৎ করতে রক্তাম্বর বেশ ধারণ করে নিজেকে ব্রহ্মচারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

শ্যামবাবু কৌশলে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে কোম্পানি খোলেন। তাঁর এই কোম্পানি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান নিজের অর্থে নয়, ধর্মপ্রাণ শেয়ার হোল্ডারদের টাকা

দিয়ে। তাই এই বিপুল অর্থ যাতে সহজে আদায় করা যায় তারজন্য শেয়ার হোল্ডারদের আকৃষ্ট করতে দেবমন্দিরে যে বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত উদ্‌বৃত্ত থাকে এবং কীভাবে তা থেকে লভ্যাংশ পাওয়া যেতে পারে, কৌশলে তার একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। বাস্তবে শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা নয়, তাদের থেকে অর্থ আত্মসাৎ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই ডিরেক্টর গণের মধ্যে রিটায়ার্ড তিনকড়ি বাবু যেমন আছেন, তেমনি আছে গন্ডেরিরাম বাটপারিয়ার মতো অসাধু লোভী ব্যবসায়ীরা। গন্ডেরিরামের কার্যকলাপ নিয়ে দেখা যায়, আগাগোড়াই মানুষকে ঠকিয়ে সে রোজগার করে। তারা মুখে যতই ধর্মের কথা বলেন কিন্তু মনে মনে লোক ঠকানোর উপায় খোঁজেন। গল্পের শেষাংশে দেখা যায়, কীভাবে সহজ সরল মানুষদের সর্বস্বান্ত করে এবং কোম্পানিকে দেনায় ফেলে যে যার নিজের প্রাপ্য টাকা গুছিয়ে নিয়ে পলায়ন করেছে।

পরশুরাম এই গল্পের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, আমাদের দেশে এরূপ লোক ঠকানো ব্যবসা প্রচুর আছে। কিছু অসাধু লোক বা ব্যবসায়ীরা ভালোর মুখোশ পরে সাধারণ মানুষকে দিনরাত ঠকিয়ে চলেছে। গল্পে এইসব ভন্ড লোকদের প্রতি লেখক কটাক্ষ করেছেন।

নিজে করো ঃ

১) "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" গল্পে শ্যামলালের চরিত্রটির পরিচয় দাও। ৫

উত্তর ঃ

২) "ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণ স্বরূপ, ধর্মকে বাদ দিয়ে এজাতির কর্ম সম্পাদন হয় না"

- কে, কোথায় কথাটি বলেছেন? ধর্ম বিষয়ে বক্তার অন্য অভিমত কী? ধর্মকে ভিত্তি

করে গল্পকার যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তার পরিচয় দাও। ১+২+২=৫

উত্তর ঃ

৩) পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসু রচিত 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের নামকরণের সার্থকতা লেখো। ৫

উত্তর ঃ

৪) 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামের কোম্পানি স্থাপনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী পরিকল্পনা উল্লেখ করো। ৫

উত্তর ঃ

৫) "এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন।" - উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনার অংশ? শ্রমহারক যন্ত্রটির নাম কী? শ্রমহারক যন্ত্রটির বিবরণ দাও। ১+১+৩

উত্তর ঃ

৬) "ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার ইন ল কোম্পানির আপিসে ডিরেক্টরগনের সভা বসিয়াছে"- ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার ইন ল' এই কোম্পানিটি কোথায় অবস্থিত? এই সভার সভাপতি কে? উক্ত সভায় ডিরেক্টরগণের মূল বক্তব্যের বিষয়বস্তু উল্লেখ করো। ১+১+৩

উত্তর :

*****

একক – ৩ (ছোটোগল্প)

অযান্ত্রিক

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)

লেখক পরিচিতি

১৯০৯ খ্রীঃ ১৪ সেপ্টেম্বর বিহারের হাজারিবাগে সুবোধ ঘোষের জন্ম। তাঁর আদি নিবাস বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বহর গ্রামে। পিতা সতীশচন্দ্র ঘোষ ও মাতা কনকলতা দেবী। পড়াশোনায় বরাবরই তিনি খুবই ভালো ছিলেন। হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্ত্তি হলেও দারিদ্র্যতার জন্য স্নাতক পাঠ্যক্রম শেষ করতে পারেননি।

মাত্র পনেরো বৎসর বয়স থেকে টীকাকরণের কাজ, বাস কনডাক্টর, গৃহশিক্ষকতা, ট্রাক ড্রাইভার, সার্কাস দল, ঝাড়ুদার, পূর্ব আফ্রিকার ঠিকাদার প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করতে হয়েছে। কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন- 'সামাণ্য রকমের একটা আর্থিক রোজগার ঘটে যেতে পারে এরকম একটি জীবিকার আশা ও কী ভয়ানক কুহকিনী হতে পারে, সেটা তিরিশ বছর বয়সের কোঠায় পা দেওয়ার আগেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছিল।'

জীবনের বহুপথ ঘুরে ত্রিশ দশকের শেষে 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সহকারী সম্পাদক। ক্রমে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট লেখক, অন্যতম সম্পাদকীয় লেখক হিসেবে যুক্ত হন।

১৯৪০ - ১৯৮০-র মধ্যে ১৫৭ টি গল্প-রচনা করেন। তাঁর প্রথম গল্প - 'অযান্ত্রিক'। বাস কনডাক্টরের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে এ গল্পটি। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ফেনিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'ফসিল', 'জতুগৃহ', 'নীলাঞ্জনা', 'চিত্তচকোর', 'অর্কিড', 'ক্যাকটাস', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'ত্রিযামা', 'শ্রেয়সী', 'শতকিয়া', 'শতভিষা' প্রভৃতি।

তিনি কালপুরুষ ছদ্মনামে একাধিক প্রবন্ধও রচনা করেন। আনন্দ পুরস্কার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন সাহিত্য সেবার জন্য। ১৯৮০ খ্রীঃ ১০ ই মার্চ এই বিরল প্রতিভার সাহিত্যিক পরলোকগমন করেন।

উৎস

সুবোধ ঘোষের 'শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন' থেকে 'অযান্ত্রিক' গল্পটি গৃহীত হয়েছে।

সারাংশ

বিমল ট্যাক্সিচালক। তার একটি পুরোনো আমলের গাড়ি আছে। এই গাড়িটিকে সে প্রাণের চাইতেও বেশী ভালোবাসে এবং কারোর থেকে গাড়িটি সম্পর্কে কটুক্তি শুনতেও নারাজ সে। তাই ভালোবেসে আদুরে ডাকনাম দিয়েছে 'জগদ্দল'। দেখতে বুড়ো হলেও খুবই কাজের এই ট্যাক্সি। ভালো ভালো দামি গাড়িও যা পারে না, বিমলের এই ট্যাক্সিটি অনায়াসে তা করে দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র গরজের খাতিরে ডাক আসে বিমলের গাড়িটির। বাস্তবে দেখতে খুবই খারাপ গাড়িটি। তালিমারা হুড, সামনের আয়নাটা ভাঙ্গা, তোবড়ানো বনেট, নোংরা ও কালিমাখা পর্দা, চাকাগুলি পটি লাগানো। পাদানিতে পা দিলেই বিকট শব্দ শোনা যায়। আর তেলের দাগ লেগে লেগে বসার জায়গাগুলো খুবই নোংরা প্রায়, এর উপর দরজাগুলোও সহজে বন্ধ হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিমলের প্রাণপ্রতিম জগদ্দল যাকে সে সন্তানের মতো ভালোবাসে।

বিমলের ট্যাক্সির হর্ন শোনামাত্র সবকটি রিক্সা সাইকেল রাস্তার কিনারায় সরে যায়। রাতের অন্ধকারে একচক্ষু দানবের মতো ছুটে যায়। সবচেয়ে বেশি ধুলো ওড়ায় আর কানফাটা চিৎকার করে। হেড লাইটের আলো নিভন্ত প্রায়, মনে হয় গাড়িটা যে কোনো সময় খুলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। লোকে ট্যাক্সিটির নাম দিয়েছে বুড্ডা ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস, কানা ভঁইস। কিন্তু বিমলের একান্ত প্রাণপ্রতিম ট্যাক্সিটি তাঁর সুদীর্ঘ পনেরো বছরের জীবনসাথী - সেবক, বন্ধু ও অন্নদাতাও বটে।

বিমল জগদ্দলের সব কথা ও কষ্ট বুঝতে পারে। তাই রাস্তায় ছুটতে কষ্ট হলে দাঁড় করিয়ে কয়েক বালতি জল রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয়। হালমডেলের গাড়ির মালিক পিয়ারা সিং যখন বিমলের বুড়িকে পেনশন দেবার কথা বলে তখন বিমল পিয়ারা সিংকে যথাযথ উত্তর দিতে দুবার ভাবেনি। কার্ত্তিক পূর্ণিমা মেলা উপলক্ষ্যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাত্রীর ভিড়ে অন্যান্য গাড়িগুলো ভালো যাত্রী পেলেও বিমলের জগদ্দলের ভাগ্যে তাও জুটল না। গোবিন্দ এসে বিমলকে বলে জগদ্দলকে বদলে ঝরিয়া থেকে মগনলালের ছয় সিলিন্ডারের গাড়িটি নিয়ে আসতে। কিন্তু বিমল এসব কথায় কান দেয় না। কারণ পরের মুখে জগদ্দল

সম্পর্কে কোনো আলোচনা বিমল সহ্য করতে পারেনা।

বিমল জল এনে জগদ্দলকে পরিষ্কার করতে লাগল। হুডটা খুব পুরোনো হয়ে গেছে। বিমল জগদ্দলকে জানায় - পুজোয় ভালো রিজার্ভ পেলে সে তাকে রেক্সিনের হুড পরাবে। তারপর কেরোসিন এনে বল্টুগুলোর মরচে মুছতে লাগল। গৌর এসে তাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করলে বিমল তাকে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয়। বিমল কৃপণ কিন্তু জগদ্দলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে কোনো কৃপণতা নেই।

সারাদিনের পাওনা ঘাটতি পূরণের জন্যে যাত্রীদের হেঁকে হেঁকে দু-জনের জায়গায় চৌদ্দজনকে উঠিয়ে নিয়ে হুশ করে স্ট্যান্ড থেকে বেড়িয়ে গেল। বিমলের ধারণা জগদ্দলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়া ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু বিমল দৃঢ়সংকল্প - 'কুছ - পরোয়া নেই জগদ্দল, আমি আর তুই আছি'।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে জগদ্দলের উপস্থিতি ছিল সূর্যোদয়ের চেয়েও নিয়মিত ও নিশ্চিত এই নিয়ে বেঙ্গলি ক্লাবে আলোচনা হয়। সকলে জগদ্দলের সাথে বিমলকেও একটা যন্ত্র ভাবে। আরবি ঘোড়ার মতো রাঁচির পথে ছুটে চলেছে জগদ্দল। কিন্তু সবদিনের নিয়ম ব্যতিক্রম করে হঠাৎ একটি পাহাড়ি মাঠের কাছে এসে থেমে পড়ল জগদ্দল। এরপর থেকে প্রতিদিন করে প্রায় তার একটি যন্ত্রাংশ বিকল হতে লাগল। কৃপণ বিমল অকৃপণ হাতে কলকাতা থেকে অর্ডার করে প্রচুর যন্ত্রাংশ আনিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জগদ্দলকে একেবারে ঝকঝকে নতুন করে তুললো। রাত্রিবেলা বৃষ্টিতে নিজের কম্বল দিয়ে জগদ্দলকে ঢেকে দিল। পরদিন স্ট্যান্ডে বিমলের অপূর্ব মিস্ত্রি প্রতিভার নিদর্শন জগদ্দলকে দেখে সবাই অবাক। তার পুরনো চেহারা পাল্টে একবারে নতুন। বিমল আবার জগদ্দলকে নিয়ে পথে নামল, কিন্তু জগদ্দলের সমস্ত শক্তি যেন শেষ। বিমল রেগে ক্লাচের উপরে সজোরে লাথি মারল। তারপর অনেকগুলো বড় বড় পাথর চাপিয়ে দিল জগদ্দলের বুকে। গাড়ি বিকট শব্দের সাথে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে চলতে লাগল। এইবার বিমল নিশ্চিত হল যে, জগদ্দলকে আর রক্ষা করা যাবে না। তার যাওয়ার সময় এসেছে। এত টাকা খরচ করেও জগদ্দলকে শেষ রক্ষা করা যায়নি বলে অতিকষ্টে বিমলের চোখ থেকে দুফোঁটা জল ঝরে পড়ল। বাড়ি ফিরে গাড়িকে গ্যারেজে না ঢুকিয়ে বাইরে রেখে উঠোনে বসে মদ খেতে লাগল।

এমন সময় গোবিন্দ এল এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পুরোনো লোহা কিনতে। বিমল পুরোনো লোহা হিসেবে চৌদ্দ আনা দরে জগদ্দলকে বিক্রি করে দিল। মাড়োয়ারি লোকজন এসে জগদ্দলের দেহ টুকরো টুকরো করে লোহা খুলে ফেললো। বিমল শুনছে সেই লোহা খোলার শব্দ। তার তখন শুধু মনে হচ্ছে জগদ্দলের পাঁজর খুলে যাচ্ছে এক এক করে। ঠং ঠং শব্দে যেন জগদ্দলের সমাধি খনন চলছে।

প্রয়োজনীয় শব্দার্থ

অব্যয় = অপরিবর্তিত, আলোয়ান = চাদর বিশেষ, অক্ষয় = যার ক্ষয় নেই, ক্ষয়হীন; ভৈরবহর্ষ = ভয়ংকর হাসি, সাবেক = পুরোনো, নির্বাণপ্রাপ্ত = নিভে যাচ্ছে এমন, প্রাগৈতিহাসিক = ইতিহাস রচনার পূর্বে, শতোধা = শত ভাগে বিভক্ত, কদর্য = বিশ্রী, নোংরা; জরাভার = বার্ধক্য, জবুথবু = জড়তাপ্রাপ্ত, ঝঞ্ঝাট = ঝামেলা, অবলীলা = সহজে, বরদাস্ত = সহ্য, অকুতোভয় = যার ভয় নেই, ক্যানেস্তারা = তেল রাখার টিন পাত্র বিশেষ, আরশি = আয়না, আওরাত = স্ত্রীলোক, অদ্ভুতকর্মা = অসাধারণ বিশেষ, রোখ = জেদ, আর্তনাদ = চিৎকার, উৎকট = তীব্র, স্নেহান্ধতা = স্নেহের বশে অন্ধ, অকুণ্ঠ = দ্বিধাহীন, উনুন = চুলো, হাঁকল = চিৎকার করে ডাকলো, গেরস্থ = গৃহস্থ, প্রচ্ছন্ন = যা দেখা যায়না, উদরগহ্বর = পেটের ভিতর, অভ্যন্তর; ষড়যন্ত্র = চক্রান্ত, ক্ষিপ্রহাতে = অতি দ্রুততার সঙ্গে, রক্ষাকবচ = বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ, গঞ্জনা = তিরস্কার, খোঁটা; সদর্পিত = গর্বের সাথে, অহেতুক = অকারণ/অনর্থক, ঈর্ষা = হিংসা, একাগ্র = একান্তে, সহচর = সঙ্গী, সাথী; মানত = মানস, প্রার্থনা; পরিপুষ্ট = পূর্ণতাপ্রাপ্ত, নিদেন = কমপক্ষে, অহর্নিশি = দিনরাত, দুঃশীল = খারাপ, প্রমত্ত = অতি জোরে, শিহরণ = কম্পিত, খনন = খোঁড়া, চড়াই = রাস্তার উর্ধ্বভাগ, উপরদিকে; গ্যালন = তরলের পরিমাপক, সুবিসর্পিত = অনেক বড়ো, ১ গ্যালন = ৪.৫লি, উৎকর্ণ = কান খাড়া করে,রুষ্ট = ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত; উপসর্গ = লক্ষণ, বিমর্ষ = অসন্তোষ, দুঃখিত; তক্তপোষ = কাঠের তৈরি বিছানা, প্রতিজ্ঞা = শপথ, বার্নিশ = রং করা, অকৃপণ = উদার, মুক্তহস্ত; বলিহারি = খুব সুন্দর, পালোয়ান = শক্তিশালী, বলবান; হতবাক = অবাক, নিরেট = নিটোল, কঠিন; বর্ষাতি = ছাতা, শতরঞ্জি = বসার জন্য কার্পেট, চাদর; উদগ্রীব = উৎকণ্ঠা, স্তুতিমুখর = প্রশংসাকারী, নিদর্শন = চিহ্ন, ধূসর = বাদামী রংয়ের, অস্বচ্ছ = যা স্বচ্ছ নয়, আবছা; ফুকার = চিৎকার, জেনুইন = খাঁটি, নির্জীব = জড়, জবাব = উত্তর, তোয়াজ = আপ্যায়ন, কামিজ = ঢিলা পোশাক, কৃতান্ত = নাশমুলক, হতভম্ব = অবাক, মহুয়া = একপ্রকার উগ্র মদ, নিষ্পলক = চোখের পাতা পড়ে না, ভবিতব্য = যা ভবিষ্যতে ঘটবে, অকেজো = নষ্ট, বিকল; শোক = দুঃখ, পাঁজর = বুক, অন্তহীন = যার শেষ নেই, সমাধি = কবর, লঘুভার = কম ওজনের, নৈঃশব্দের আবর্তে = শব্দহীনভাবে চাকার মত ঘোরা।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ মান : ১

১. 'অযান্ত্রিক' ছোটগল্পটি কার লেখা?

উত্তর ঃ 'অযান্ত্রিক' ছোটগল্পটি গল্পকার সুবোধ ঘোষের লেখা।

২. 'অযান্ত্রিক' গল্পের কাহিনি কোন্ অঞ্চলের?

উত্তর ঃ 'অযান্ত্রিক' গল্পের কাহিনী বিহারের রাঁচির অভ্রখনি অঞ্চলের।

৩. 'অযান্ত্রিক' শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'অযান্ত্রিক' শব্দটির অর্থ - যা যন্ত্র সম্পর্কিত নয়।

৪. গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্রটির নাম কি?

উত্তর ঃ গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্রটির নাম বিমল।

৫. বিমলের গাড়িটি কোন কোম্পানির তৈরি?

উত্তর ঃ বিমলের গাড়িটি ফোর্ড কোম্পানির তৈরি।

৬. ট্যাক্সিটির গঠন কীরূপ?

উত্তর ঃ ট্যাক্সিটির গঠন প্রাগৈতিহাসিক, সর্বাঙ্গে কদর্য দীনতার ছাপ।

৭. বিমলের গাড়িতে কারা চড়ে?

উত্তর ঃ যে খুব দায়ে পড়েছে সে বিমলের গাড়িতে চড়ে।

৮. বিমলের গাড়িটির শ্রী কীরূপ?

উত্তর ঃ বিমলের গাড়ির তালিমারা হুড, সামনের আয়নাটা ভাঙ্গা, তোবড়ানো বনেট, কালিঝুলি মাখা পর্দা ও চারটে টায়ারে পটি লাগিয়ে সে এক অপূর্ব শ্রী পেয়েছে।

৯. একচক্ষু দানব কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ একচক্ষু দানব বলা হয়েছে বিমলের গাড়িটিকে।

১০. বিমল ভালোবেসে গাড়িটির কি নাম দিয়েছে?

উত্তর ঃ বিমল ভালোবেসে গাড়িটির নাম দিয়েছে 'জগদ্দল'।

১১. সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বিমলের গাড়িটি কি কি নামে বিশেষিত হয়েছে?

উত্তর ঃ সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বিমলের গাড়িটি নাম পেয়েছে - বুড়ঢা ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস, কানা ভঁইস।

১২. বিমলের গাড়িটি তার কত বছরের জীবনসাথী?

উত্তর ঃ বিমলের গাড়িটি তার সুদীর্ঘ পনেরো বছরের জীবনসাথী।

১৩. বিমলের ট্যাক্সিটির চালক কে?

উত্তর ঃ বিমলের ট্যাক্সিটির চালক বিমল স্বয়ং।

১৪. 'এবার তোমার বুড়িকে পেনশন দাও' - কার উক্তি?

উত্তর ঃ 'এবার তোমার বুড়িকে পেনশন দাও' - পিয়ারা সিংয়ের উক্তি।

১৫. বিমলের রাগ কীরূপ?

উত্তর ঃ বিমলের রাগ বুনো ধরনের।

১৬. বিমলের গাড়ির হর্নকে লেখক কী বলেছেন?

উত্তর ঃ বিমলের গাড়ির হর্নকে লেখক ভৈরব হর্ষ বলেছেন।

১৭. জগদ্দল সর্ম্পকে বিমল কি ভাবে?

উত্তর ঃ জগদ্দলকে বিমল সেবক, বন্ধু ও অন্নদাতা মনে করে।

১৮. কার্তিক পূর্ণিমায় কোথায় মেলা বসে?

উত্তর ঃ কার্তিক পূর্ণিমায় ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে বারো মাইলদূরে নরসিংহ দেবের মন্দিরে মেলা বসে।

১৯. 'কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না।' - উক্তিটি কার?

উত্তর ঃ 'কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না।' - উক্তিটি গোবিন্দের।

২০. ভাড়া না পাওয়ার শোধ বিমল কখন তুলবে বলে জানালো?

উত্তর ঃ ভাড়া না পাওয়ার শোধ বিমল ওভারলোড নিয়ে সন্ধ্যাবেলাতে তুলবে বলে জানালো।

নিজে করো ঃ

২১. জগদ্দলের সাথে কার এক্সচেঞ্জের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ

২২. কার সম্পর্কে পরের মুখে আলোচনা বিমল সহ্য করেনা?

উত্তর ঃ

২৩. পুজোয় রিজার্ভ পেলে বিমল কি করবে?

উত্তর ঃ

২৪. 'ভাঙ্গা মন্দিরে চুনকাম' - কার উক্তি?

উত্তর ঃ

২৫. 'গাড়িভি ঘরকা আওরাত হ্যায় ক্যা?' - কার উক্তি?

উত্তর ঃ

২৬. বুলাকি পাগলার কীসের উপর স্নেহান্ধতা ছিল?

উত্তর ঃ

২৭. বিমল মেলার সন্ধ্যায় কয়জন যাত্রী নিয়েছিল?

উত্তর ঃ

২৮. জগদ্দলের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে বলে বিমলের মনে হয়?

উত্তর ঃ

২৯. পথচারী মানুষরা জগদ্দলের প্রতি কীরূপ আচরণ করে?

উত্তর ঃ

৩০. 'কুছ পরোয়া নেই। আমি আর তুই আছি।' - কার প্রতি কার উক্তি করা হয়েছে?

উত্তর ঃ

৩১. ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে জগদ্দলের উপস্থিতি কেমন ছিল?

উত্তর ঃ

৩২. সমব্যবসায়ী ট্যাক্সিচালক মহলে ঈর্ষার কারণ কী ছিল?

উত্তর ঃ

৩৩. 'হে বাবা, জগদ্দল যেন বিকল না হয়।' -কার কাছে কার এইরূপ প্রার্থনা?

উত্তর ঃ

৩৪. 'লোকটাও একটা যন্ত্র' - কোথায় আলোচনা হয়?

উত্তর ঃ

৩৫. জগদ্দল প্রতি গ্যালনে কত মাইল দৌড়ে যায়?

উত্তর ঃ

৩৬. জগদ্দল কীসের মতো প্রমত্ত বেগে ছুটে চলেছে?

উত্তর ঃ

৩৭. 'সুমুখে পড়ল' - সুমুখে কি পড়ল?

উত্তর ঃ

৩৮. 'এত বড় বিশ্বাসের পাহাড়টা বুঝি টলে উঠল' - কার প্রতি কার বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ

৩৯. 'তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই।' - কার উক্তি?

উত্তর ঃ

৪০. গাড়ির যন্ত্রাংশ কোথায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ

৪১. জগদ্দলকে সারাতে বিমল কি কি বিক্রি করেছিল?

উত্তর ঃ

৪২. স্ট্যান্ডের উদগ্রীব জনতা জগদ্দলকে ঘিরে ধরেছিল কেন?

উত্তর ঃ

৪৩. বিমল জগদ্দলের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

উত্তর ঃ

৪৪. গল্পাংশে 'লোহার বাচ্চা' ও 'নির্জীব' ভূত বলে কাকে সম্বোধিত করা হয়েছে?

উত্তর ঃ

৪৫. বিমলের গাড়ির পাদানিতে পা দিলে কেমন শব্দ হয়?

উত্তর ঃ

৪৬. বিমল জগদ্দলের উপর কয়টি পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল?

উত্তর ঃ

৪৭. বিমল কোন্ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ

৪৮. গোবিন্দ কাকে সঙ্গে করে কেন, কার কাছে নিয়ে এসেছিল?

উত্তর ঃ

৪৯. মাড়োয়ারি ভদ্রলোক পুরোনো লোহার দাম কত বলেছিল?

উত্তর ঃ

৫০. 'এমনিতে ফিরবে না সে।' - 'সে' কে?

উত্তর ঃ

৫১. কার সমাধি খনন চলছে?

উত্তর ঃ

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **মান- ৫**

১. 'জগদ্দলের সমাধি খনন চলছে' - কার লেখা, কোন্ রচনার অন্তর্গত? জগদ্দলের সমাধি খনন কীভাবে চলছে তা বর্ণনা করো। ১+২+২=৫

উত্তর ঃ উপরোক্ত উক্তিটি গল্পকার সুবোধ ঘোষের লেখা 'অযান্ত্রিক' শীর্ষক ছোটগল্পের অন্তর্গত।

বিমলের একটি প্রিয় ফোর্ড ট্যাক্সি ছিল, যার নাম জগদ্দল। এটি বিমলের সুদীর্ঘ পনেরো বছরের সাথী হওয়ার সাথে সাথে যথাক্রমে সেবক, বন্ধু ও অন্নদাতাও বটে। গাড়িটিকে নতুন রূপ দিতে গিয়ে সে তার সর্বস্ব বিকিয়ে দেয়। নতুন দামি জেনুইন পার্টস লাগিয়েও গাড়িটির আগের মত গতি ও পূর্ণশক্তি আসে না, তদুপরি লোড নেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়। অবশেষে সব ধরনের পরীক্ষা, নিরীক্ষার পর বিমল নিশ্চিন্ত যে - 'জগদ্দলকে যমে ধরেছে'। জগদ্দল অসমর্থ, তার গাটে গাটে আর্তনাদ বেজে ওঠে। এই চিন্তায় বিমল শোক ভোলানোর জন্য যখন মহুয়া নিয়ে বসে তখনই গোবিন্দ এক মাড়োয়ারী লোহা

ব্যবসায়ীকে নিয়ে হাজির হয়। গোবিন্দকে বিস্মিত ও হতচকিত করে বিমল তার প্রিয় জগদ্দলকে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাছে পুরোণো লোহা দরে বিক্রি করতে রাজি হয়ে যায়। দীর্ঘ পনেরো বছরের সাথীকে বিদায় দিয়েও বিমল শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। রাতের তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ও গাড়ি ভাঙ্গার ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং শব্দ তার কানে ভেসে আসে। বিমলের মনে হয় তখন জগদ্দলের সমাধি খনন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, গাড়িটির সাথে বিমলের আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাই তা জড় হলেও প্রাণসত্ত্বার অস্তিত্বে উন্নীত হয়েছিল। তাই গাড়িটি ভাঙ্গার শব্দ বিমলের কাছে মানব শরীরের সমাধি খনন অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়।

নিজে করো ঃ

২. 'অযান্ত্রিক' গল্পে জড়বস্তুর প্রতি মানবিক সত্ত্বা আরোপের ফলে যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা গল্প অবলম্বনে আলোচনা করো।
অথবা, 'অযান্ত্রিক' গল্পে যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে লেখক যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করেছেন তা আলোচনা করো।
উত্তর :

৩. "এত বড় বিশ্বাসের পাহাড়টা শেষে বুঝি টলে উঠল"
- কার, কোন্ গল্পের উক্তি? 'বিশ্বাসের পাহাড়' কথাটি বলা হল কেন? 'বিশ্বাসের পাহাড়' কীভাবে টলে উঠল? ১+২+২=৫
উত্তর :

৪. "সে এক অপূর্ব শ্রী" - কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? তার অপূর্ব শ্রী-র বর্ণনা দাও। ১+৪=৫
উত্তর :

৫. 'জগদ্দল বিমলের সাথি, সেবক, বন্ধু ও অন্নদাতা'
- কোন্ রচনার অংশ? উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ১+৪=৫
উত্তর :

৬. "এমনিতে ফিরবেনা সে, শ্রেষ্ঠা ভিক্ষা চাই" - সে বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে? কোন্ প্রসঙ্গে কে এমন ভেবেছে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির এমন ভাবার কারণ কী? ১+২+২=৫
উত্তর :

৭. "জগদ্দলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়াটা ষড়যন্ত্র করছে" -উক্তিটি কোন্ রচনার অন্তর্গত? কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? বক্তার এমন মনোভাবের কারণ কী? ১+১+৩=৫
উত্তর :

৮. "লোকটাও একটা যন্ত্র - বেঙ্গলি ক্লাবে আলোচনা হয়।"
- কোন্ লোকটার কথা বলা হয়েছে? লোকটি সম্পর্কে বেঙ্গলি ক্লাবের এই ধরনের মত পোষণ করার কারণ কী? ১+৪=৫
উত্তর :

*****

একক – ৪

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করে সাধারণ পরিচয় ঃ উইলিয়াম কেরি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

আধুনিক যুগের অন্যতম সাহিত্যিক বাহন হল গদ্য। এই গদ্যের আবির্ভাব আধুনিক যুগ ছাড়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য আধুনিক যুগের আগে গদ্য যে ছিলনা তা নয়, কিন্তু তার প্রকাশ ছিল বিচ্ছিন্নভাবে-দু একটি চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে। আধুনিক বাংলা গদ্য ইউরোপীয় সংসর্গের ফল। আধুনিক জীবনের যুক্তিবোধ, ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতাবোধ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গদ্যের ব্যবহার একান্তভাবেই প্রয়োজন ছিল।

খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের পূর্বে গদ্যের ব্যবহার বিচ্ছিন্নভাবে যেসব ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল সেগুলি হল ঃ

ক) চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজের গদ্য। খ) নিবন্ধ ও কড়চা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত গদ্য।

গ) গল্পের গদ্য। ঘ) পর্তুগীজদের গদ্য চর্চা।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। (আসলে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেইদিনই নিয়মাবলী গৃহীত হয়। কিন্তু তখন লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে পরাজিত করে ফিরে এসেছিল। সেই গৌরবের স্মৃতিকে ধরে রাখতে যদিও ১৮ই আগস্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস তবুও টিপু সুলতানের পরাজয়ের তারিখ ৪ঠা মে ১৭৯৯ কে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়)। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রোভোস্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন রেভা. ডেভিড ব্রাউন। পরে ১৮০১-এ বিভাগীয় প্রধান হন রেভা. উইলিয়াম কেরী এবং ১৮৩৪ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত বিষয়ের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত (১৮০১) হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। এছাড়া অন্যান্য পণ্ডিত ও মুনসিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সি প্রমুখ।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভর্নর জেনারেল -এর প্রচারিত নির্দেশ থেকে জানা যায় যে, স্বদেশ আগত সিভিলিয়ানদের এদেশের ভাষা ও সাহিত্য নিশ্চিত করা বিদেশী শাসকদের এদেশীয় ভাষা, ইতিহাস ও আচরণ-আচরণাদির জ্ঞানার্জন করা বাধ্যতামূলক ছিল। তাই এই কলেজের শিক্ষণ ব্যবস্থাকে উপলক্ষ্য করে বাংলা গদ্য ভাষা গতিশীলতা লাভ করেছিল। আর তা প্রধানত সম্ভব হয়েছিল এই কলেজের বাংলা সংস্কৃত ভাষার অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরীর ক্লান্তিহীন মৌলিক চেষ্টার ফলে। কেরী নিজে শুধু অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেননি, পন্ডিত ও মুন্সিদের দিয়ে তিনি গদ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নীচে কেরী ও পন্ডিত-মুন্সিদের অনুবাদ কর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হলো।

ফোর্ট উইলিয়াম গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। এই ১৮০১ থেকে ১৮২২ পর্যন্ত রচিত ও মুদ্রিত গ্রন্থগুলোর বিবরণ ঃ

* উইলিয়াম কেরি ঃ- কথোপকথন - ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ, ইতিহাস মালা - ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ, A Grammar of Bengali - ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ
* রামরাম বসু ঃ- রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র - ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ, লিপিমালা - ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ
* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ঃ- বত্রিশ সিংহাসন - ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ, হিতোপদেশ - ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ, রাজাবলি - ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ, প্রবোধচন্দ্রিকা - ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ, বেদান্তচন্দ্রিকা - ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ,
* গোলক নাথ শর্মা ঃ হিতোপদেশ - ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ
* হরপ্রসাদ রায় ঃ পুরুষ পরীক্ষা - ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ
* রামকিশোর তর্কচূড়ামনি ঃ হিতোপদেশ - ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ
* তারিণী চরণ মিত্র ঃ ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট - ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ
* চন্ডীচরণ মুন্সি ঃ তোতা ইতিহাস - ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ
* মোহন প্রসাদ ঠাকুর ঃ ইংরেজী বাংলা শব্দকোষ - ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ
* রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় ঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং - ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ
* কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ঃ- পদার্থ কৌমুদি - ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ, আত্মতত্ত্ব কৌমুদি - ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ

উইলিয়াম কেরী

ইংল্যান্ডের পলার্সপুরী গ্রামে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট উইলিয়াম কেরি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম এডমন্ড এবং মাতার নাম এলিজাবেথ।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর উইলিয়াম কেরি প্রধাণত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসেছিলেন। এদেশীয় ভাষায় বাইবেল রচনার জন্য তিনি প্রথমে ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করেন জাহাজে টমাসের কাছে। এরপর বাংলা ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করেন রাম রাম মুন্সীর কাছ থেকে। ক্রমাগত দু-বছরের আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি এই ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দান, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করা এবং বাইবেলের অনুবাদে নিযুক্ত হয়েছেন। ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১ মে তিনি লর্ড ওয়েলেসলির নির্দেশে ও, প্রোভোস্ট ডেভিড ব্রাউনের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব নেন।

সাহিত্য সম্ভার

ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যসৃষ্টি হল 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। গোপাল হালদার বলেছেন, "কেরির অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠার লক্ষ্য যদিও ধর্মপ্রচার, কিন্তু তার ভিত্তি এই বৈজ্ঞানিক চেতনা, বাস্তববুদ্ধি, মানুষ ও পৃথিবীকে জানবার ও চেনবার আগ্রহ"। বস্তুত: কেরী ছিলেন বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনের পথ নির্দেশক।

রামরাম বসু

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম পন্ডিত রামরাম বসু বাংলা গদ্যের উদ্ভব পর্বের বিশিষ্ট রচয়িতা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কায়স্থ সন্তান রামরাম বসু কেরির অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। তাঁর লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এটিই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত প্রথম পাঠ্যপুস্তক। রামরাম বসুর জন্ম আনুমানিক ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে, হুগলির চুঁচুড়ায়। ১৭৮৭-তে ব্যাপটিস্ট মিশনের জন টমাসের বাংলা শিক্ষকরূপে রামরাম নিযুক্ত হন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ৪০ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন এবং ১৮১৩ পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ফরাসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', 'লিপিমালা'। তিনি কেরী সাহেবের মুন্সি নামে পরিচিত।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকমন্ডলীর মধ্যে যারা পরবর্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেব, পন্ডিত ও মুনসিদের মধ্যে পান্ডিত্য, মনীষা ও ঔদার্যে মৃত্যুঞ্জয় শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে বাংলা গদ্যের উদ্ভব পর্বে তিনি একজন যথার্থ শিল্পী। তাঁর কৃতিত্ব রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রতিভার ছায়ায় ঢাকা না পড়ে গেলে তিনি একজন অসাধারণ শিল্পী ব্যক্তিত্ব হতে পারতেন।

ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার সময় মৃত্যুঞ্জয়ের পান্ডিত্যের খ্যাতি দেশে ছড়িয়ে পড়ায় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে উইলিয়াম কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার প্রধান পন্ডিত নিযুক্ত হন। এখানে অবস্থানকালে তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থ রচিত হয় - 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি', 'প্রবোধচন্দ্রিকা', 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'। মৃত্যুর পর প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। তাঁর সরল বাংলা ও আলংকারিক বাংলা ভাষার এক অপূর্ব সমন্বয় বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁকে যে স্মরণীয় করে রাখবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর অবদানের ফলশ্রুতিতে বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বের বিকাশ ও বিবর্তনে এই কলেজের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা গদ্যের জনক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলা গদ্যের তিনি প্রথম যথার্থ শিল্পী। তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণ, নিছক সাহিত্যতত্ত্ব নয়, তিনি শিল্প সম্মত গদ্যরীতির উদ্ভাবয়িতা।

বিদ্যাসাগরের রচনাবলীকে অনুবাদ মূলক এবং মৌলিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। মৌলিক রচনাসমূহ এবং তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলি বিচিত্র। হিন্দি, সংস্কৃত এবং ইংরেজি থেকে বিদ্যাসাগর বাংলায় গদ্যগ্রন্থ অনুবাদ করে গদ্য ভাষাকে সরস এবং ভারবহনক্ষম করে তোলেন।

* অনুবাদমূলক রচনা -

১. বাসুদেব চরিত - ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ - 'ভাগবতে'র শ্রীকৃষ্ণ লীলার অনুবাদ। ২. বেতাল পঞ্চবিংশতি - ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ - (' হিন্দি বেতাল পচ্চীসী'র অনুবাদ)। ৩. শকুন্তলা - ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ - ('অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের অনুবাদ)। ৪. সীতার বনবাস - ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ - ('রামায়ণের উত্তরাকান্ডে'র আখ্যানুবাদ)। ৫. ভ্রান্তি বিলাস - ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ - (Comedy of Errors এর গদ্যানুবাদ)।

* পাঠ্য পুস্তক নির্ভর অনুবাদমূলক রচনা -

১. বাঙ্গালার ইতিহাস - ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ - (মার্শম্যানের History of Bengal অবলম্বনে)। ২. জীবন চরিত - ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ - (চেম্বার্সের Biographics J Rudiments of knowledge অবলম্বনে)। ৩. বোধোদয় - ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ - (অনুবাদমূলক)। ৪. কথামালা - ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ - (ঈশপের ফেবলস্ অবলম্বনে)।

* মৌলিক রচনা -

১. সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব - ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ। ২. প্রভাবতী সম্ভাষণ - ১৮৬৩। ৩. বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব - ১ম ও ২য় খন্ড - ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ। ৪. 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'- ১ম খন্ড-১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ এবং ২য় খন্ড-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

৫. 'বিদ্যাসাগরচরিত' - ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ।

* লঘু রস মিশ্রিত মৌলিক রচনা -

১. অতি অল্প হইল (১৮৭৩) - ('কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামক ছদ্মবেশে রচিত)। ২. আবার অতি অল্প হইল - ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ। ৩. ব্রজবিলাস - ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। ৪. রত্ন পরীক্ষা - ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা নিয়েই এ বিষয়ের উপসংহার করা যেতে পারে, "বিদ্যাসাগর গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুশৃঙ্খল, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।"

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর লেখো : মান– ১

১. বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ।

২. কে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে সুষমামন্ডিত করে তোলেন?

উত্তর ঃ বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে সুষমামন্ডিত করে তোলেন।

৩. বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ব্যবহার কোথায় কোথায় দেখা যায়?

উত্তর ঃ বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ব্যবহার দেখা যায় চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ রচনায়,

ধর্মীয় প্রয়োজনে লেখা 'কড়চা' ও নিবন্ধ জাতীয় রচনায় এবং ইউরোপীয়দের ধর্মপ্রচার ও শাসনকার্যের জন্য লিখিত রচনায়।

৪. কোন্ দুটি গ্রন্থের জন্য কেরি গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন?

উত্তর ঃ 'কথোপকথন' এবং 'ইতিহাস মালা' এই দুটি গ্রন্থের জন্য কেরি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে আছেন।

৫. বিদ্যাসাগরের ছদ্মনাম কী?

উত্তর ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছদ্মনাম - 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য সহচরস্য' এবং 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য'।

৬. 'বোধোদয়' গ্রন্থটি কার কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ?

উত্তর ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' গ্রন্থটি চেম্বার্সের 'Rudiments of knowledge' গ্রন্থের অনুবাদ।

৭. 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বিদ্যাসাগর কোন্ গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেন?

উত্তর ঃ 'হিন্দি বৈতাল পচ্চিসী' থেকে বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।

৮. 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থটি কোন্ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত?

উত্তর ঃ শেকস্পীয়রের 'Comedy of errors' গ্রন্থ অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তি বিলাস' গ্রন্থটি রচনা করেন।

৯. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পন্ডিত কে ছিলেন?

উত্তর ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পন্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

নিজে করো ঃ

১০. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর ঃ

১১. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর ঃ

১২. কাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা যেতে পারে?

উত্তর ঃ

১৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের নাম কী?

উত্তর ঃ

১৪. বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ

১৫. কোন্ দুটি গ্রন্থের জন্য উইলিয়াম কেরী গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন?

উত্তর ঃ

১৬. 'লিপিমালা' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

উত্তর ঃ

১৭. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের রচিত প্রথম গ্রন্থ কোন্‌টি?

উত্তর ঃ

১৮. 'প্রবোধচন্দ্রিকা' কে, কবে রচনা করেন?

উত্তর ঃ

১৯. 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর ঃ

২০. 'কেরী সাহেবের মুন্‌সি' কাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ

২১. কোন্ বিদেশি নাটক অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থটি রচিত হয়?

উত্তর ঃ

২২. 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কার লেখা?

উত্তর ঃ

২৩. 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ

২৪. 'আখ্যানমঞ্জরী' গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর ঃ

২৫. 'তোতাইতিহাস' কার লেখা?

উত্তর ঃ

২৬. 'পুরুষপরীক্ষা' কার লেখা?

উত্তর ঃ

২৭. 'কথামালা' গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?

উত্তর ঃ

২৮. কোন্ গল্প অবলম্বনে 'কথামালা' গ্রন্থটি রচিত?

উত্তর ঃ

২৯. বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কি?

উত্তর ঃ

৩০. বিদ্যাসাগরের লেখা দুটি ব্যাঙ্গাত্মক রচনার নাম লেখো।

উত্তর ঃ

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৬**

১. বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ

২. বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ

৩. বাংলা গদ্যের বিকাশে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অবদান লেখো।

উত্তর ঃ

৪. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ রামমোহন বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা দূর করেছিলেন, অক্ষয়কুমার তার আড়ষ্টতা দূর করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে লালিত্য দান করলেন, অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর থেকে মুক্ত করে - "গ্রাম্য পান্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য ভাষারূপে গঠিত করিয়া দিয়াছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

উনিশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনির্বচনীয় এক যুগান্তকারী ঘটনা। পান্ডিত্য, মানবিকতাবোধ, সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার এবং তেজস্বিতায় তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

রচনাসম্ভার ঃ

১. **অনুবাদমূলক রচনা ঃ** 'শকুন্তলা' - কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের গদ্যানুবাদ। 'সীতার বনবাস' -বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকান্ড ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' - এর অনুসরণে রচিত। 'ভ্রান্তিবিলাস' - শেকসপীয়রের 'Comedy of Errors' - এর অনুবাদ। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' - হিন্দি 'বৈতাল পচ্চীসী' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' - মার্শম্যানের 'History of Bengal' - এর অনুবাদ। 'জীবনচরিত' - চেম্বার্সের 'Biographics' - এর অনুবাদ। 'বোধোদয়' 'Rudiment of knowledge' অবলম্বনে রচিত। 'কথামালা' ঈশপ্স্ ফেবল্স্ এর অনুবাদ।

২. **মৌলিক রচনা ঃ** 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'।

৩. **পাঠ্যপুস্তক শ্রেণির রচনা ঃ** 'বর্ণপরিচয়', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'আখ্যান মঞ্জরী'।

৪. **লঘু রস মিশ্রিত লৌকিক রচনা ঃ** 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতিঅল্প হইল', ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা।

বিদ্যাসাগর বাংলা সাধু গদ্যরীতির প্রথম সচেতন শিল্পী। শিল্পসম্মত গদ্যরীতির তিনিই উদ্ভাবক। তাঁর লেখনীতে বাংলা গদ্য শিল্প প্রাণ হয়ে উঠেছে। ছেদ-যতির সমন্বয়ে ভাষা সহজ ও অর্থবহ হয়েছে। ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল হওয়া সত্ত্বেও অপূর্ব ছন্দময়, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণান্বিত হয়েছে। বাংলা গদ্য তাঁর হাতে সার্থক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ও সবরকম ভাবপ্রকাশের বাহক হয়েছে তার রচনা সম্ভারগুলো। অনেক বিতর্কের তুফান শেষে বলা যায় তিনিই বাংলা গদ্যের সাধুভাষারীতির জনক।

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর বলেছেন - "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্য-কুশলতা দান করিয়াছেন"।

পরিশেষে বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সেটি আসলে ছিল 'Age of Reason'এবং 'Right of man' -এর যুগ। এককথায় বলা যায় যুক্তির দ্বারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাল বা যুগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন সেই সার্থক কালের পুরোহিত।

*****

একক – ৪

মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের পরিচয়

মধুসূদন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিকাব্যের পরিচয় ঃ বিহারীলাল চক্রবর্তী

মহাকাব্য

সাধারণত যে কাব্যের মধ্যে সমগ্র জাতির জীবনচিত্র প্রতিবিম্বিত হয়, জাতির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভৌগোলিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, জীবনবোধের গভীরতা এবং সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি পড়ে সেই কাব্যকেই মহাকাব্য বলে।

উৎস

মহাকাব্য নামটি সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করলেও ইংরেজিতে 'এপিক' বলতে যা বোঝায় মহাকাব্যকে সেই অর্থেই বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে। 'এপিক' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে, যার তার অর্থ হল শব্দ এবং গান।

*** পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এপিককে দু-ভাগে ভাগ করেছেন -**

১. Authentic Epic এবং ২. Literary Epic। এই Authentic Epic-কে আবার অনেকে Epic of growth বলে উল্লেখ করেছেন। Authentic একটি সমগ্রতা তথা সর্বজনীনতা নিয়ে রচিত এবং গোটা জাতির সভ্যতা ও জীবনচর্চার পরিচয়বাহী। সামগ্রিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বহনকারী। এদিক থেকে শুধু রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি-কেই মহাকাব্য বলে বিবেচিত করা হয় এবং এদের Authentic Epic বলে।

Literary Epic-এ প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে কবির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মিশ্রণ ঘটেছে। এক্ষেত্রে ভার্জিলের 'ইনিড', ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড', কালিদাসের 'কুমার সম্ভব', 'রঘুবংশ', মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য

'সাহিত্য দর্পন'-এ বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. মহাকাব্য সর্বাধিক ৩০টি সর্গ এবং ন্যূনতম ৯টি সর্গে বিধৃত হবে। ২. প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনা থাকবে। ৩. বিভিন্ন সর্গ একই ছন্দে লিখিত হবে। সর্গের শেষে অন্য ছন্দের ব্যবহার থাকলেও থাকতে পারে। ৪. মহাকাব্যের প্রারম্ভে আশীর্বাদ; নমস্কার অথবা বস্তু নির্দেশ থাকবে। ৫. সত্য ঘটনা বা ঐতিহাসিক কাহিনি মহাকাব্যের উপজীব্য হবে। ৬. মহাকাব্যের নায়ককে হতে হবে কোনো দেবতা বা সদ্‌বংশজাত, ধীরোদাত্ত গুণ সম্পন্ন এবং ক্ষত্রিয়। ৭. মহাকাব্যে চন্দ্র, সূর্য, সাগর, রজনী, প্রভাব, মৃগয়া, বন, পর্বত, জলক্রীড়া, বিপ্রলম্ভ, বিবাহ, বিরহ, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা থাকবে। ৮. মহাকাব্যের রচনা অলংকার এবং রসভার সংবলিত হবে। ৯. শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্তরসের যে-কোনো একটি হবে মহাকাব্যের অঙ্গীরস এবং অন্যরসগুলি প্রধান রসের অঙ্গ হবে। ১০. কবি বর্ণিত নায়ক বা অন্য কারোর নাম অনুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হবে। আর সর্গ মধ্যে যে-কথা প্রাধান্যলাভ করবে সেই বিষয় বা তাৎপর্য অনুসারে সর্গের নামকরণ হবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রবল জোয়ারে যখন সারা দেশ তথা বাংলা প্লাবিত, তখন সেই আধুনিক সময়স্রোতে প্রগতিভাবনামূলক নবজাগৃতির সমগ্র ভাবধারাটিকেই আত্মস্থ করে যে - কবি মহাপুরুষ সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম দিলেন এবং মৌলিক তথা সাহিত্যিক মহাকাব্য লিখলেন সার্থকভাবে, তিনি হলেন দত্ত কুলোদ্ভব মধুকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

* মধুসূদন দত্ত সৃষ্ট কাব্যসম্ভার ঃ

ইংরেজী ভাষায় লেখা কাব্য -

১. Captive Lady : A vision of the past (1849),

২. Queen Seeta,

৩. Tilottoma,

৪. Upsori, ৫. Other poems

বাংলা ভাষায় লেখা কাব্য ঃ

১. আখ্যানকাব্য ঃ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)

২. মহাকাব্য ঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)

৩. ওড্‌জাতীয় কাব্য ঃ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১)

৪. পত্র কাব্য ঃ 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)

৫. সনেট ধর্মী রচনা ঃ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' (১৮৬৬)

৬. গদ্যকাব্য ঃ 'হেক্টরবধ কাব্য' (অসম্পূর্ণ)

৭. গীতি কবিতা ঃ 'আত্মবিলাপ' (১৮৬২), 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২)

আখ্যান কাব্য

কোনো কাব্য যখন বিশেষ কোনো কাহিনি বা আখ্যানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, সাধারণত তাকে আখ্যান কাব্য বলে।

আখ্যান কাব্যের বৈশিষ্ট্য

১. এই কাব্যের মধ্যে আগাগোড়া কোনো একটি কাহিনির বর্ণনা করা হয় আনুপূর্বিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। ২. কাহিনির প্রাধান্যের কাছে চরিত্র এখানে অনেকটা গৌণ হয়ে যায়। ৩. আখ্যানের মধ্যে পারিপার্শ্বিক পার্শ্বঘটনা বা চরিত্র এলেও তা কখনোই মূল আখ্যানকে ছাড়িয়ে যাবে না। ৪. আখ্যান কোনো মতেই বিশ্লেষণধর্মী হবে না। কাহিনির পরম্পরা বজায় রাখবে। ৫. বর্ণনাধর্মিতা এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৬. অলংকার প্রকাশের বাহুল্য যেমন থাকবে না, তেমনি তার পাশাপাশি ছন্দের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। ৭. বিষয় অবশ্যই একমুখী হবে। মহাকাব্যের মতো কখনোই বহুমুখী হবে না। ৮. সাধারণত ঐতিহাসিক ঘটনা, কোনো বীরের কার্যকলাপ, ধর্মীয় ব্যাপার নিয়েই আখ্যান কাব্যের আখ্যান গড়ে ওঠে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭ - ১৮৮৭)

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বপ্রথম যৌবনের আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চেতনামূলক আখ্যানকাব্যের জন্ম দিলেন। একদিকে মানবতা ও ইতিহাস চেতনা অন্যদিকে আখ্যান ও কাব্য এ-সবেরই মিলিত প্রবাহমান স্রোতে দৃঢ় হাতে কবিতার হাল ধরে বাংলা কাব্যের অনাগত যৌবনের মুক্তি বিধাতা হয়ে উঠলেন।

*** রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যসম্ভার ঃ**

১. কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যের অনুবাদ (১৮৫১)। ২. 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮) - হোমারের ব্যঙ্গকাব্য Batrachomyomachia কাব্যের অনুবাদ। ৩. সংবাদ প্রভাকর প্রকাশিত 'পার্নেল' ও গোল্ড স্মিথের 'হার্মিট' কাব্যের অনুবাদ। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) (কর্নেল টর্ডের 'Annals and Antiquites of Rajasthan'-এর অনুসরণে)। ৪. কর্মদেবী (১৮৬২) ৫. শূরসুন্দরী (১৮৬৮) ৬. 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অনুবাদ (১৮৭২) ৭. নীতিকুসুমাঞ্জলি (১৮৭৫) ৮. কাঞ্চি কাবেরী (১৮৭৯)

গীতি কবিতা

কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন সহজ ও সাবলীল গতিতে সংগীত মুখর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে বলে গীতি কবিতা। সংগীত ধর্মিতাই হল গীতি কবিতার প্রাণের কথা।

ইংরেজি সাহিত্যে যা Lyric, তাই-ই বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতা। গ্রীক বাদ্যযন্ত্র Lyre থেকেই Lyric শব্দটির উৎপত্তি। প্রাচীন গ্রীসে Lyre বা বীণাযন্ত্রযোগে এই শ্রেণির কবিতা গীত হত বলে একে গীতি কবিতা বলা হয়। গীতি কবিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - "গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য এবং ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য"। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন - "যখন কোনো সঙ্গী পাই তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি। না পাইলে সেই ভাবসঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি - এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি।"

গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য

১. কবি হৃদয়ের একান্ত ব্যক্তিগত ভাবাবেগের প্রকাশ। ২. গীতি কবিতার একক আত্মমগ্ন অনুভবের তীব্রতা, সংবেদনশীল ভাষা ও সুরের অন্তর্লীন স্পর্শ পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। অর্থাৎ কবি ও পাঠকের নিবিড় রসসংযোগই গীতি কবিতার প্রধান আকর্ষণ। ৩. কবি চিত্তের ব্যক্তিগত অনুভূতি-সংবেদনের মন্ময়তা সত্ত্বেও গীতি কবিতার এক সার্বজনীন আবেদন ও মূল্য থাকে। ৪. গীতি কবিতা যতখানি আবেগ অনুভূতিমূলক, সাধারণভাবে ততখানি চিন্তামূলক নয়। ৫. সংহত, সংক্ষিপ্ত অবয়ব বিন্যাসে সার্থক গীতি কবিতা শব্দ-ছন্দ-সুর-তাল ব্যঞ্জনায় এক সুসমন্ডিত শিল্পরূপ, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রীতি, ধর্মীয় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়েই গীতি কবিতা রচিত হতে পারে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৪ - ১৮৯৪)

গীতি কবিতার আর এক জনক হলেন, নীরব কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। যাঁর দেখানো পথই কিনা সার্থক গীতি কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কারক। তাই বাংলা কাব্যসাহিত্যে সত্যিই প্রথম সার্থক গীতি কবিতার আনয়নকারী হিসেবে বিহারীলাল চক্রবর্তীই বাংলাকাব্যের ইতিহাসে ভোরের পাখি, যাঁর সুললিত মধুর গীতিতে সমগ্র পাঠক সমাজ 'আপনাকে আপনি' আনন্দগানে বিভোর করতে পেরেছিল।

*বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যসম্ভার ঃ

১. স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), ২. সংগীত শতক (১৮৬২), ৩. বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), ৪. নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), ৫. প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭১), ৬. সারদামঙ্গল (১৮৭৯), ৭. মায়াদেবী (১৮৮২), ৮. ধূমকেতু (১৮৮২), ৯. বাউল বিংশতি (১৮৮৭), ১০. সাধের আসন (১৮৮৯), ১১. গোধূলি (১৮৯৯)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. মহাকাব্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ সাধারণত যে কাব্যের মধ্যে সমগ্র জাতির জীবনচিত্র প্রতিবিম্বিত হয়, জাতির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভৌগোলিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, জীবনবোধের গভীরতা এবং সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি পড়ে সেই কাব্যকেই মহাকাব্য বলে।

২. মহাকাব্যকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

উত্তর ঃ মহাকাব্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - আদি মহাকাব্য ও সাহিত্যিক মহাকাব্য।

৩. সাহিত্যিক মহাকাব্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোনো একজনের নিজস্ব চেষ্টায় লেখা, যার মধ্যে জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছায়া অপেক্ষা ব্যক্তিগত চেতনার স্পর্শ বেশি থাকে, তাকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বলে। যেমন - মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

৪. আদি মহাকাব্য কি?

উত্তর ঃ যে মহাকাব্যে জাতীয় জীবনের সমগ্র সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরা পড়ে, তাকে আদি মহাকাব্য বলে। উদাহরণ - রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি।

৫. গীতি কবিতা কাকে বলে?

উত্তর ঃ যে কবিতায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন সহজ ও সাবলীল গতিতে সংগীতমুখর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে বলে গীতি কবিতা।

৬. মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য কোনটি?

উত্তর ঃ মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য হল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'।

৭. 'ভেক-মুষিকের যুদ্ধ' কাব্যটি কার লেখা?

উত্তর ঃ 'ভেক-মুষিকের যুদ্ধ' কাব্যটি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা।

৮. 'সংগীতশতক' কাব্যটির স্রষ্টা কে?

উত্তর ঃ 'সংগীতশতক' কাব্যটির স্রষ্টা হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী।

নিজে করো ঃ

৯. বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?

উত্তর ঃ

১০. আধুনিক বাংলা আখ্যানকাব্য ধারার প্রথম কবি কে?

উত্তর ঃ

১১. বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যটির নাম কী?

উত্তর ঃ

১২. বাংলা ভাষায় প্রথম গীতিকাব্য কোন্‌টি?

উত্তর ঃ

১৩. বাংলা সাহিত্যে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার স্রষ্টা বা জনক কে?

উত্তর ঃ

১৪. ঊনিশ শতকে 'ওড'-ধর্মী দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ

১৫. বিহারীলাল চক্রবর্তীর শেষ কাব্যের নাম কী?

উত্তর ঃ

১৬. 'সঙ্গীত শতক' ও 'বন্ধু বিয়োগ' কাব্যটি কে রচনা করেছেন?

উত্তর ঃ

১৭. 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ

১৮. 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি কবে প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ

১৯. মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য কোন্‌টি?

উত্তর ঃ

২০. কে বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' অভিধা দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ

২১. বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য কোন্‌টি?

উত্তর ঃ

২২. 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে কতজন নারী চরিত্রের কথা আছে?

উত্তর ঃ

২৩. 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থটি কে রচনা করেন?

উত্তর ঃ

২৪. 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' কার লেখা?

উত্তর ঃ

২৫. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর ঃ

২৬. 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কয়টি সর্গ আছে?

উত্তর ঃ

২৭. 'স্বপ্নদর্শন' কাব্যগ্রন্থটি কার রচনা?

উত্তর ঃ

২৮. মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যটি কোন্‌ বিদেশি কাব্য অবলম্বনে রচিত?

উত্তর ঃ

২৯. মধুসূদনের প্রথম ও শেষ কাব্যগ্রন্থের নাম কি?

উত্তর ঃ

৩০. 'বৃত্রসংহার' কাব্যটির রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ

৩১. 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটির রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন : **মান– ৬**

১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের পৌরাণিক নারী চরিত্র অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলির পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নবজাগরণের ইতিহাসে অসাধারণ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সংস্কার মুক্ত আধুনিক জীবনাদর্শ ও মানবতাবাদের বলিষ্ট প্রবক্তা ছিলেন তিনি। যেমন ছিল তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার ঐশ্বর্য। ঊনিশ শতকীয় নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনার আলোয় আলোকিত হয়ে তিনি এদেশীয় পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলিকে নতুনভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। এইরূপ ভাবনার ফলশ্রুতিতে - 'তিলোত্তমাসম্ভব', ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' রচনা করেন।

ক) 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) ঃ মাইকেলের কাব্যপ্রতিভা শুরু হয়েছিল 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের মধ্য দিয়ে। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে চারটি সর্গে রচিত হয় তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। সুন্দ ও উপসুন্দ হল কাহিনির মূল উপাদান। তাদের মধ্যে শত্রুতা আনার জন্য তিলোত্তমার সৃষ্টি। তিলোত্তমার কল্পনা ও তার রূপায়নই এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে কবির রোমান্টিক মন ও সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ পেয়েছে এই কাব্যে। কবি সম্ভবত মিলটনকে আদর্শ করেই এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

খ) 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১) ঃ বৈষ্ণবীয় আদি রসাত্মক, রোমান্টিক পরিবেশ ও প্রেমের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এই কাব্যে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাইকেলের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এই কাব্যে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাইকেলের কবিমানসের যে লিরিক কবিতার প্রতি আকর্ষণ রাধার বিরহ প্রসঙ্গ নিয়ে কাব্য রচনায় তিনি তারই প্রেরণা লাভ করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বর্ণময়তা, ওজস্বিতা ত্যাগ করে' দেশজ ভাষার ছন্দস্পন্দকে তিনি এখানে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

গ) 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) ঃ বীরাঙ্গনা কাব্যটি রোমান কবি ওভিদের 'হিরোইড্স্'-এর আদর্শে রচিত। এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব এবং অনন্য সংযোজন। কাব্যটি নব যুগের বাঙালির নারীচেতনার প্রথম কাব্যিক শিল্প অভিব্যক্তি। এই কাব্যে এগারোটি পত্র আছে। পত্রগুলি সংলাপী নাটকের রীতিতে লিখিত। বাংলা সাহিত্যে এটি প্রথম পত্রকাব্য। দ্রৌপদী, জনা, জাহ্নবী, দুঃশলা, ভানুমতী, শকুন্তলা, কৈকয়ী, রুক্মিণী, শূর্পনখা, উর্বশী ও তারা প্রভৃতি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিচিত্র ভাবতরঙ্গ পত্রগুলিতে চিত্রিত হয়েছে।

পরিশেষে বলতে পারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে নব ভাবধারায় মহাকাব্যের উদগাতা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, চতুর্দশপদীর স্রষ্টা, পত্রকাব্যের জন্মদাতা। ভগীরথের মতো দুশ্চর তপস্যার ব্রতী হয়ে বিশ্বসাহিত্যের অমৃত ধারাকে তিনি বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করে এনেছেন। পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্য মন্থন করে বাংলা সাহিত্যে তিনি নব প্রাণধারা সঞ্চারিত করেছেন।

২. বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যে মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর :

৩. মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর :

৪. বাংলা গীতিকাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর অবদান আলোচনা করো।

উত্তর :

৫. বাংলা কাব্য সাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান কতখানি তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর :

*****

একক – ৪

কাব্যের সাধারণ পরিচয়/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা বিস্ময়কর। তাঁর বিচিত্র চিন্তা ও কর্মের প্রবাহ, বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে, তাঁর সাহিত্য রচনায়, বিচারে ও ব্যাখ্যানে যে পরিচয়টি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তা হল তাঁর কবি প্রকৃতি। এই কবি প্রকৃতি সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের চিরন্তন প্রবাহের মধ্যে তিনি আকণ্ঠডুব দিয়েছেন ও সেই অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছেন। জগৎকে তিনি দেখেছেন ঋষিসুলভ অখণ্ড দৃষ্টিতে যার মাধ্যমে আনন্দ রূপকে উপলব্ধি করেছেন। জীবন স্মৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, "সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপূর্ণ বস্তুপূর্ণ করিয়া দেখা গেলনা, তাহাকে আগা গোড়া পরিপূর্ণ দেখিলাম।" তাঁর এই প্রত্যয় দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ বিশ্ব সত্যের-ই প্রকাশ এবং তাই তিনি বিশ্বকবি।

রবীন্দ্র কাব্যসরণি

মানবজীবনের পটভূমিতে যত পরিবর্তন দেখা দেয়, তার প্রতি তরঙ্গেই ঋতু বদল দেখা দেয়। এই ঋতু বদলের কথা মনে রেখে কবির কাব্যগুলিকে কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। পর্বগুলি হল -

১. সূচনা পর্ব (১৮৭৫ - ১৮৮২) ঃ হিন্দুমেলার উপহার, অভিলাষ, কবি-কাহিনি, ভগ্নহৃদয়, শৈশব সংগীত, রুদ্রচন্ড, বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া ইত্যাদি কবিতার সংকলন।

২. উন্মেষ পর্ব (১৮৮২ - ১৮৮৬) ঃ সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সংগীত, কড়ি ও কোমল, ছবি

ও গান, ভানুসিংহ, ঠাকুরের গান ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ।

৩. **ঐশ্বর্য পর্ব (১৮৮৭ - ১৮৯৬) ঃ** মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯০), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬)।

৪. **অন্তর্বর্তী পর্ব (১৮৯৭ - ১৯১০) ঃ** কথা (১৮৯৯), কাহিনি (১৯০০), কল্পনা (১৯০০), কণিকা(১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), স্মরণ (১৯০২), শিশু (১৯০৩), উৎসর্গ, খেয়া (১৯০৬)।

৫. **গীতাঞ্জলি বা আধ্যাত্ম পর্ব (১৯১০ - ১৯১৫) ঃ** গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৫)।

৬. **বলাকা পর্ব (১৯১৫ - ১৯২৯) ঃ** বলাকা (১৯১৬), পলাতকা (১৯১৮), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া(১৯২৯)।

৭. **পুনশ্চ পর্ব (১৯৩০ - ১৯৩৮) ঃ** বনবানী (১৯৩১), পরিশেষ (১৯৩২), বিচিত্রিতা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), শ্যামলী (১৯৩৯)।

৮. **অন্তিম পর্ব (১৯৩৮ - ১৯৪১) ঃ** প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), আকাশ প্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষলেখা(১৯৪১)।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮ - ১৯৭৬)

সাম্যের গান রচয়িতা নজরুল, সৃষ্টি সুখের উল্লাসের কবি নজরুল আমাদের প্রিয় কবি। কেননা নজরুলের ব্যক্তিত্বকে, মানুষ নজরুলকে, প্রেমিক নজরুলকে, কবি নজরুলকে, সঙ্গীতজ্ঞ নজরুলকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন মৈত্রীর কবি নজরুলকে বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে নজরুলের মৌলিকত্বের আর এক কারণ তিনি মানুষের কবি। তিনি সব মানুষের সমান অধিকার ও সম্ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, যৌবন প্রেম, বীরধর্ম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। আর এগুলো তাকে পরবর্তীকালে কবিদের কাছে নতুন পথের দিশা যুগিয়েছে।

কাব্যসারণি

১. অগ্নিবীণা (১৯২২), ২. দোলন চাঁপা (১৯২৩), ৩. বিষের বাঁশী (১৯২৪), ৪. ভাঙার গান (১৯২৪), ৫. চিত্তনামা (১৯২৫), ৬. ছায়ানট (১৯২৫), ৭. সাম্যবাদী

(১৯২৫), ৮. পূবের হাওয়া (১৯২৬), ৯. ঝিঙেফুল (১৯২৬), ১০. সর্বহারা (১৯২৬), ১১. ফণীমনসা (১৯২৭), ১২. সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৮), ১৩. সঞ্চিতা (১৯২৮), ১৪. চক্রবাক (১৯২৯), ১৫. প্রলয়শিখা(১৯৩০) ইত্যাদি।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯ - ১৯৫৪)

বিংশ শতকের আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরও নতুন কথা নতুনভাবে বলা হয় একথা ভেবেছিলেন ও সেকথা আমাদের শোনাতে চেয়েছিলো, জীবনানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল বিশ্বাস, শ্রান্তিহারক আশাবাদ জীবনানন্দের ছিলনা, থাকার কথাও নয়। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে 'যক্ষ্মায় ধুঁকে মরে মানুষের মন'। তাই রবীন্দ্রযুগে বসে জীবনানন্দ একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, পেরেছেনও। সে জগৎ ঈশ্বর জগতের অনুকরণ নয়, মায়াবী জগতের ব্যাখ্যা নয় - অনুভূতির আলোছায়ায় তৈরি চেতনার জগৎ। এখানেই তাঁর অনন্যতা। এজন্য তাঁকে যথার্থ একজন নতুন কবির মতোই যেমন ভাষা ও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষায় বসতে হয়েছে তেমনই চিত্র রচনায় 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' থেকে 'দারুচিনির দ্বীপ' পর্যন্ত ঘুরে ফিরতে হয়েছে।

কাব্য সারণি

১. ঝরা পালক (১৯২৭), ২. ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), ৩. বনলতা সেন (১৯৪২), ৪. মহাপৃথিবী (১৯৪৪), ৫. সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), ৬. বেলা অবেলা কালবেলা(১৯৬১), ৭. রূপসী বাংলা (১৯৫৭), ৮. সুদর্শনা (১৯৭৩)।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো : মান–১

১. রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্যে প্রথম গদ্যছন্দ ব্যবহার করেন?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যে প্রথম গদ্যছন্দ ব্যবহার করেন।

২. লঘু হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় এমন দুটি রবীন্দ্রকাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' এবং 'ছড়া ও ছবি' কাব্য গুলিতে লঘু হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্যে মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেছেন?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যে মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

৪. রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্যের জন্য, কত খ্রিস্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পান?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ 'The Song offerings' কাব্যের জন্য, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পান।

৫. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নজরুলের কোন্ কাব্যের অন্তর্গত?

উত্তর ঃ 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কাব্যের অন্তর্গত।

৬. 'রূপসী বাংলার কবি' কাকে বলা হয়?

উত্তর ঃ কবি জীবনানন্দ দাশকে 'রূপসী বাংলার কবি' বলা হয়।

৭. রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ সম্বলিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ সম্বলিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল - গীতাঞ্জলি (১৯১১), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৫)।

৮. রবীন্দ্রকাব্যের 'উন্মেষপর্বের' সময়কাল লেখ।

উত্তর ঃ রবীন্দ্রকাব্যের উন্মেষপর্ব ১৮৮২ খ্রিঃ থেকে ১৮৯৬ খ্রিঃ পর্যন্ত।

৯. জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে চিত্ররূপময় কে বলেছেন?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে চিত্ররূপময় বলেছেন।

১০. 'পলাতকা' ও 'পূরবী' রবীন্দ্রনাথের কোন্ পর্বের রচনা?

উত্তর ঃ 'পলাতক' ও 'পূরবী' কাব্য দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' পর্বের রচনা।

১১. 'ভানুসিংহ ঠাকুরর পদাবলী' কার লেখা?

উত্তর ঃ 'ভানুসিংহ ঠাকুরর পদাবলী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

নিজে করো ঃ মান-১

১২. রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থটি কত খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়?

উত্তর ঃ

১৩. বাংলা সাহিত্যে পরাবাস্তববাদের প্রবর্তক কে?

উত্তর ঃ

১৪. রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যের নাম কী?

উত্তর ঃ

১৫. রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত প্রথম কাব্যের নাম কী?

উত্তর ঃ

১৬. 'সাম্যবাদী' ও 'অগ্নিবীণা' কাব্যদুটির কবি কে?

উত্তর ঃ

১৭. রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম মুদ্রিত কবিতা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ

১৮. জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থটির নাম কি?

উত্তর ঃ

১৯. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থটির নাম কি?

উত্তর ঃ

২০. জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ

২১. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ ঋতুর নাম লেখো।

উত্তর ঃ

২২. নজরুলের দুটি শিশু বিষয়ক কবিতার নাম লেখো।

উত্তর ঃ

২৩. নজরুলের কবিতা সংকলন গ্রন্থটির নাম কী?

উত্তর ঃ

২৪. 'মানসী' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর ঃ

২৪. রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্বের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?

উত্তর ঃ

২৬. কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উত্তর ঃ

২৭. 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যটি কার রচনা?

উত্তর ঃ

২৮. জীবনানন্দ দাশের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী?

উত্তর ঃ

৩০. কাজী নজরুল ইসলামের ছদ্মনাম কী?

উত্তর ঃ

৩১. 'ঝরাপালক' কাব্যটি কার রচনা?

উত্তর ঃ

৩২. 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কী ধরনের কবিতা?

উত্তর ঃ

৩৩. 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি কার রচনা?

উত্তর ঃ

৩৪. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কার লেখা?

উত্তর ঃ

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পর্বের দুটি কাব্যের নাম লেখো।

উত্তর ঃ

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যছন্দে রচিত কাব্যটির নাম কী?

উত্তর ঃ

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : **মান – ৬**

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৬

উত্তর ঃ

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থগুলিকে কটি পর্বে ভাগ করা যায় ও কী কী? ৬

উত্তর ঃ

৩. কাজী নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভা সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৬

অথবা, কাজী নজরুল ইসলামকে 'রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত' বলার কারণ কী? কাব্যের নাম উল্লেখ করে তার প্রতিভা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর ঃ

৪. বাংলা কাব্য জগতে জীবনানন্দ দাশের কাব্য প্রতিভার পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ রবীন্দ্র-উত্তর যুগে যে-সমস্ত কবি আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তিনি রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কল্লোল যুগের কবি, বাংলার কবি। তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারি। বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য মুগ্ধ কবির সৌন্দর্যনুভূতি নানা ছন্দে তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে।

কাব্য সারণি ঃ ঝরা পালক (১৯২৭), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), বেলা অবেলা কালবেলা(১৯৬১), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), সুদর্শনা (১৯৭১), জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪)।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্বন্ধে স্বয়ং রবি ঠাকুরের মন্তব্য হল - 'চিত্ররূপময়'। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে পাঠকের ইমপ্রেসনিস্টদের ছবির কথা মনে পড়বেই। কবি-শিল্পী যেমনটি চোখে দেখছেন অর্থাৎ চোখের ক্যানভাসে রং আলো ছায়া ইত্যাদি নিয়ে যা ভেসে উঠল তাই-ই অবিকল শব্দ-পদ-বাক্যের দ্বারা কবিতার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলাই ছিল জীবনানন্দের অন্যতম কবিধর্ম।

প্রকৃতির মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন সান্ত্বনা, বাঁচার ইন্ধন, খুঁজে নিয়েছেন দেশপ্রেমের মহান মন্ত্র। 'রূপসী বাংলা' কাব্যে বাংলাদেশের নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। বাংলার প্রকৃতির মধ্যেই তিনি পৃথিবীর রূপ খুঁজে পেয়েছেন। মৃত্যুর পর তিনি বাংলার প্রকৃতির মধ্যেই ফিরে আসার বাসনা প্রকাশ করেছেন - "আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির তীরে/এই বাংলায়"। তাঁর কবিতায় পল্লি বাংলার তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস ও অপরিমেয় ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবির ইতিহাস চেতনা কোনো সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। মৃত্যু সম্পর্কে কবির ভাবনা ও স্বতন্ত্র, মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তিনি বাস্তবের আঙিনায় নিজের স্বতন্ত্র বিলীন করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় প্রেম-চেতনা পাখির নীড়ের মতো নিশ্চিত আশ্রয় চেয়েছে।

বিশ্বের আর কোনো কবির কণ্ঠে বোধহয় শোনা যায়নি - "হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি আমি পৃথিবীর পথে"। যে কবি নিজেই বিশ্বাস করেন - "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান"। বা যে-কবি নিজেই বলেন - "মহাবিশ্বের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি অপরিহার্য সত্যের মত" - সেই কবির কাব্যে ইতিহাস চেতনা যে প্রখর হয়ে থাকবে - একথা বলা বাহুল্য।

পরিশেষে বলতে পারি জীবনানন্দের কবিতাগুলি শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শের। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, গ্রাম্য আটপৌরে শব্দ ব্যবহারে, দুরুহ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, চিত্রকল্প নির্মাণে তিনি বাংলাকাব্যে নতুন উপাদান জুগিয়েছেন। এছাড়া আধুনিকযুগে জীবনানন্দ সর্বদাই চিরায়ত ধূসর স্বপ্ন অবলোকন করতেন। স্বপ্নশূন্য কালে স্বপ্নের কবি হলেন জীবনানন্দ দাশই। নিত্য প্রবহমান মহাজীবনের কবি। প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দের মতো আধুনিক কবিরা জীবনে ক্ষয়িষ্ণুরূপ প্রত্যক্ষ করে জড়া ও মৃত্যুচেতনায় ক্লান্ত ও অবসন্ন। আর সেখানেই হেমন্ত আর প্রান্তরের কবি জীবনানন্দের হেমন্ত আর প্রান্তরকেন্দ্রিক চিত্রকল্প সার্থক। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথায় - "আমাদের যুগমানসের ভাষা প্রথম উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের কবিতায়"।

*****

একক – ৪

নাটক

মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বিজন ভট্টাচার্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩)

ঊনিশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রবল জোয়ারে যখন সারাদেশ তথা বাংলা প্লাবিত, তখন সেই আধুনিক সময় স্রোতে প্রগতি ভাবনামূলক নবজাগরণের সমগ্র ভাবধারাটিকেই আত্মস্থ করে যিনি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সার্থক নাটকের সন্ধান দিলেন তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩), যাঁকে আমরা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা ও যিনি মৌলিক মহাকাব্যের প্রথম কবি হিসেবে বেশি পরিচিত।

বিশেষত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ে আমন্ত্রিত হয়ে ব্যথিত হয়েছিলেন। এর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলা নাট্যামোদী দর্শককুলকে উপহার দিলেন 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নামের পৌরাণিক নাটক। এরপরের বছর আর একটি পৌরাণিক নাটক - 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)। এই বছরেই দুটি প্রহসন লিখলেন তিনি - 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। এর পরের বছরেই বাংলা নাট্য সাহিত্য পেল সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। এছাড়া ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন 'মায়াকানন' নামক রূপক নাটক এবং 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক অসমাপ্ত নাটক।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০ - ১৮৭৩)

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পর যিনি সর্বব্যাপী সামাজিক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে সমকালীন বাঙালির শাশ্বত জীবনবোধ ও বিক্ষুব্ধ গণজীবনকে

কেন্দ্র করে নাটককে গণজাগরণের হাতিয়ার করে তুললেন, তিনি হলেন দীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যসম্ভার

১. নীলদর্পণ (১৮৬০) - (সামাজিক নাটক), ২. সধবার একাদশী (১৮৬৬) - (প্রহসন), ৩. বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) - (প্রহসন), ৪. জামাই বারিক (১৮৭২) - (প্রহসন), ৫. লীলাবতী (১৮৬৭) - (কমেডিধর্মী নাটক), ৬. কমলে কামিনী (১৮৭৩) - (কমেডিধর্মী নাটক), ৭. নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) - (কমেডিধর্মী নাটক)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষ ভিড় করে আছে। বিশেষ করে রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। নাটক নিয়ে তিনি নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভাকে আলোচনার সুবিধার জন্য ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - ১. গীতি নাট্য, ২. কাব্য নাট্য, ৩. কৌতুক নাট্য, ৪. রূপক বা সাংকেতিক বা তত্ত্ব নাটক, ৫. সামাজিক নাটক, ৬. নৃত্য নাট্য।

নাট্যসম্ভার

১. **গীতি নাট্য ঃ** বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৮২), নলিনী (১৮৮৪)

২. **কাব্য নাট্য ও নাট্য কাব্য ঃ** রুদ্রচন্ড (১৮৮১), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), রাজা ও রানী (১৮৮১), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৮৯২), মালিনী (১৮৯২), নরকবাস (১৯০০), গান্ধারীর আবেদন (১৯০০), কর্ণকুন্তী সংবাদ (১৯০০)

৩. **কৌতুক নাট্য ঃ** গোড়ায় গলদ (১৮২২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৫)

৪. **রূপক বা সাংকেতিক বা তত্ত্ব নাটক ঃ** শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), গুরু (১৯১৮), অরূপ রতন (১৯১৯), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৪), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), পরিত্রাণ (১৯২৯), কালের যাত্রা (১৯৩২), রথের রশি (১৯৩২)

৫. **সামাজিক নাটক ঃ** গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), বাঁশরী (১৯৩৩), নটীর পূজা (১৯২৬)

৬. নৃত্যনাট্য ঃ শাপমোচন (১৯৩১), তাসের দেশ (১৯৩৩), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চন্ডালিকা (১৯৩৬), শ্যামা (১৯৩৯)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩- ১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একাধারে কবি, নাট্যকার, সংগীত রচয়িতা, সুরকার, গায়ক এবং একজন স্বদেশ প্রেমিক। নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি মূলত নাট্যসাহিত্যে আধুনিক নাটকের বৈশিষ্ট্য রূপায়নে। রচনার আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের দিক থেকে তিনি বাংলা নাটকের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন দিকের আগমন ঘটালেন। নাট্য সাহিত্যে তাঁর অবদান মূলত ঐতিহাসিক নাট্যকাররূপে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য আঙ্গিককে নাট্যসাহিত্যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যথেষ্ট। তাছাড়া ঊনিশ শতকের বাংলাদেশে নব চেতনার বিকাশে তাঁর নাটকগুলির ভূমিকা ছিল অসামাণ্য।

নাট্যসম্ভার

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনাকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন -

১. ঐতিহাসিক নাটক ঃ 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সোরাব রুস্তম' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহ বিজয়' (১৯১৫)

২. সামাজিক নাটক ঃ পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৬)

৩. পৌরাণিক নাটক ঃ পাষাণী (১৯০০), সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪)

৪. প্রহসন ঃ 'একঘরে' (১৮৮৯), 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'এ্যহস্পর্শ' বা 'সুখী পরিবার' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১), 'আনন্দ বিদায়' (১৯১২)

বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫ - ১৯৭৮)

বাংলা নাট্যরচনার চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যার কথা সাধারণ মানুষকে দেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক রচনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজন ভট্টাচার্য - যিনি গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। শুধু নাট্য রচনা নয়, অভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। তাঁর নাটক রচনার উৎস হল মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা - যা তীক্ষ্ণ সমাজ দৃষ্টি থেকে

উদ্ভূত। বিশেষ করে নাটকের মধ্যে প্রগতিমূলক চিন্তার রূপায়ণে এবং তার প্রসারে বিজন ভট্টাচার্যের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য।

নাট্যসম্ভার

১. **পূর্ণাঙ্গ নাটক ঃ** আগুন (১৯৪৩), জবানবন্দি (১৯৪৩), নবান্ন (১৯৪৪), অবরোধ (১৯৪৭), জতুগৃহ (১৯৫২), গোত্রান্তর (১৯৫৭), মরাচাঁদ (১৯৬০), ছায়াপত্র (১৯৬১), মাস্টারমশাই (১৯৬১), দেবীগর্জন (১৯৬৬), কৃষ্ণপক্ষ (১৯৬৬), ধর্মগোলা (১৯৬৭), গর্ভবতী জননী (১৯৬৯), আজ বসন্ত (১৯৭০), সোনার বাংলা (১৯৭১), চলো সাগরে (১৯৭৭)

২. **একাঙ্ক নাটক ঃ** মরা চাঁদ (১৯৪৬), কলঙ্ক (১৯৫০), জননেতা (১৯৫০), সাগ্নিক (১৯৬৮), লাশ ঘুইর‍্যা যাউক (১৯৭০), চুল্লি (১৯৭৪), হাঁসখালির হাঁস (১৯৭৭)

৩. **রূপক নাটক ঃ** স্বর্ণকুম্ভ (১৯৭০) ;

৪. **গীতি নাট্য ঃ** জীয়ন কন্যা (১৯৪৭)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো : মান– ১

১. ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে?

উত্তর - অতীত ইতিহাসের তথ্য, ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করে, সেই বিশেষ সময়ের স্পন্দনকে যে নাটকে বিবৃত করা হয়, তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে।

যেমন - মধুসূদন দত্ত রচিত 'কৃষ্ণকুমারী'।

২. পৌরাণিক নাটক কাকে বলে?

উত্তর - পুরাণের বিষয়, ভাবাদর্শন ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে যে নাটক রচিত হয়, তাকেই পৌরাণিক নাটক বলে। যেমন - গিরিশ চন্দ্র ঘোষের রচিত 'জনা', দ্বিজেন্দ্রলালের - পাষাণী।

৩. সামাজিক নাটক কাকে বলে?

উত্তর - সমাজ, সমাজবদ্ধ মানুষ ও তাদের নানাবিধ সমস্যাকে নাট্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে যে নাটক রচিত হয়, তাকে সামাজিক নাটক বলে। যেমন - গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'প্রফুল্ল', দ্বিজেন্দ্রলালের - 'পরপারে'।

৪. 'প্রহসন' কাকে বলে?

উত্তর - বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রবণতা, প্রাচীন ও নব্যপন্থী মানুষদের চারিত্রিক অসঙ্গতি অবলম্বনে, যে ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক নাটক বা গল্প রচিত হয় তাকে 'প্রহসন' বলে। যেমন - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'এক ঘরে'।

৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটকের নাম কী?

উত্তর - মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটকের নাম হল 'শর্মিষ্ঠা'।

৬. মধুসূদনের রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকটির নাম লেখো।

উত্তর - মধুসূদনের রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক হল 'কৃষ্ণকুমারী'।

৭. মধুসূদন কোন্ নাট্যশালায় নাটক দেখতে গিয়েছিলেন?

উত্তর - মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় নাটক দেখতে গিয়েছিলেন।

৮. 'পদ্মাবতী' নাটকের কাহিনি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর - গ্রীক পুরাণের গল্প 'Apple of Discord' - এর কাহিনি অনুসরণে 'পদ্মাবতী' নাটকের কাহিনি সংগৃহীত হয়েছিল।

৯. কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর - কর্নেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনি নেওয়া হয়েছে।

১০. 'সধবার একাদশী' নাটকটি কার রচনা?

উত্তর - 'সধবার একাদশী' নাটকটির নাট্যকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র।

১১. 'কমলে কামিনী' নাটকটি কার লেখা?

উত্তর - 'কমলে কামিনী' নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রের লেখা।

১২. ' নীলদর্পণ' নাটকটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর - 'নীলদর্পণ' নাটকটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

১৩. 'নীলদর্পণ' নাটকটিকে কোন্ গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর - 'নীলদপণ' নাটকটিকে "Uncle Tom's Cabin" গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

১৪. 'নবীন তপস্বিনী' নাটকটি কার লেখা?

উত্তর - 'নবীন তপস্বিনী' নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রের লেখা।

১৫. 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকটি কত খ্রিস্টাব্দে রচিত?

উত্তর - 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকটি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রচিত।

১৬. বিজন ভট্টাচার্যের দুটি একাঙ্ক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর - বিজন ভট্টাচার্যের দুটি একাঙ্ক নাটকের নাম হল - 'মরা চাঁদ' ও 'জননেতা'।

নিজে করো ঃ (মান - ১)

১৭. 'পদ্মাবতী' নাটকের রচয়িতা কে?

উত্তর -

১৮. কোন্ নাটকের অভিনয় দেখে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটক রচনায় উৎসাহী হন?

উত্তর -

১৯. 'নীলদর্পন' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ কে করেন?

উত্তর -

২০. রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চমাঙ্ক' নাটকগুলি কোন্ রীতি অনুসারে রচিত?

উত্তর -

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

২২. বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক কোন্‌টি?

উত্তর -

২৩. রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

২৩. দীনবন্ধু মিত্রের লেখা প্রথম নাটকটির নাম কী?

উত্তর -

২৪. মধুসূদন দত্তের একটি পৌরাণিক ও একটি প্রহসনধর্মী নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

২৫. 'দেবী গর্জন' নাটকটি কার রচনা?

উত্তর -

২৬. 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের রচয়িতা কে?

উত্তর -

২৭. দীনবন্ধু মিত্রের দুটি প্রহসনের নাম লেখো।

উত্তর -

২৮. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি পৌরাণিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

২৯. 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনটি কার রচনা?

উত্তর -

৩০. 'বিসর্জন' কোন্ উপন্যাসের নাট্যরূপ?

উত্তর -

৩১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

৩২. 'নবান্ন' নাটকের রচয়িতার নাম লেখো।

উত্তর -

৩৩. 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি কার রচনা?

উত্তর -

৩৪. রবীন্দ্রনাথের দুটি সাংকেতিক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম নাটকের নাম কী?

উত্তর -

৩৬. 'নীলদর্পণ' নাটকটি কার, কোন্ ছদ্মনামে প্রথম প্রকাশিত হয়?

উত্তর -

৩৭. নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল কোন্ নাটকের হাত ধরে?

উত্তর -

৩৮. দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ নাটকটির নাম কী?

উত্তর -

৩৯. বিজন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাটকটির নাম কী?

উত্তর -

৪০. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দুটি দেশাত্মবোধক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

৪১. 'সাজাহান' নাটকটি কার লেখা?

উত্তর -

৪২. রবীন্দ্রনাথের দুটি ব্যঙ্গাত্মক নাটকের নাম লেখো।

উত্তর -

৪৩. রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্য নাট্যের নাম লেখো।

উত্তর -

৪৪. মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকটির নাম কি?

উত্তর -

৪৫. মধুসূদন দত্তের লেখা শেষ নাটকটির নাম কি?

উত্তর -

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গীতি নাট্যের নাম লেখো।

উত্তর -

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো : **মান– ৬**

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের স্থান নির্ণয় করো।

উত্তর - বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের পর দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব।

নাটকের বিষয়বস্তুর উপাদানের জন্য পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়াই সাধারণ মানব-মানবীর জীবনকে নিয়ে যে বাস্তবোচিত নাটক সৃষ্টি করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন হল দীনবন্ধু মিত্রের নাটক সমূহ। আর তাঁর প্রধান কৃতিত্ব তিনি নাটকের মতো মিশ্র কলাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে দেন। যার ফলে বাস্তবিক মনুষ্য চরিত্র ও সময়কালে প্রতিচ্ছবি জনচিত্তে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

নাট্য গ্রন্থাবলী ঃ 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'জামাইবারিক' (১৮৭২), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)

দীনবন্ধু মিত্রের রচিত নাটকগুলোর মধ্যে যে নাটকটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত করে মানুষের হৃদয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, সেটি হল - 'নীলদর্পণ'। যখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে নীল চাষীদের জীবন অতিষ্ঠ। সেই অত্যাচারের কাহিনি বাস্তব সম্মতভাবে এই নাটকে তিনি তুলে ধরেছেন। প্রকাশ্য মঞ্চে আত্মহত্যা, বালিকা বধূহত্যা, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি শ্বাসরোধকারী ঘটনা তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গীতে বিবৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'নীলদর্পণ' হল বাংলার "Uncle Tom's Cabin"। কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। 'নীলদর্পণ' তৎকালীন বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের অন্যান্য নাটকের মধ্যে অন্যতম হল 'নবীন তপস্বিনী', 'কমলে কামিনী'। তবে দীনবন্ধু মিত্রের যথার্থ বিকাশের মূর্ত প্রকাশ ঘটে তার প্রহসন সুলভ নাটকের মাধ্যমে। যেমন - 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী'। এছাড়া 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', 'পোড়া মহেশ্বর' নামে দুটি কবিতাও রচনা করে সমাদর লাভ করেছিলেন।

২. বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য প্রতিভার পরিচয় দাও। ৬

উত্তর -

৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো। ৬

উত্তর -

৪. দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর ভূমিকা কী? ৬

উত্তর -

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব আলোচনা করো। ৬

উত্তর -

৬. রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাংকেতিক নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৬

উত্তর -

*****

একক – ৪

কথা সাহিত্য (উপন্যাস ও ছোটোগল্প)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় - "বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন"। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ লগ্নে 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। বঙ্কিম প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে একসূত্রে করেছিল বলেই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর খ্যাতি যুগপৎ স্রষ্টা ও সম্পাদকরূপে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র মাধ্যমে স্রষ্টা বঙ্কিমের আবির্ভাব এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকরূপে আবির্ভাব নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ঘটনা। কারণ, 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস এবং বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে তিনি বাঙালির হৃদয় মনে স্থান লুঠ করে নিয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা "Rajmohan's wife" (১৮৬৪) গ্রন্থটি কিশোরী চাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'Indian Field' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৬৪)।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সৃষ্টি-সরণি

১. ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস - ক) দুর্গেশনন্দিনী - ১৮৬৫, খ) কপালকুন্ডলা -১৮৬৬, গ) মৃণালিনী - ১৮৬৯, ঘ) যুগলাঙ্গুরীয় - ১৮৭৪, ঙ) চন্দ্রশেখর - ১৮৭৫, চ) সীতারাম - ১৮৮৭।

২. সামাজিক উপন্যাস - ক) বিষবৃক্ষ - ১৮৭৩, খ) কৃষ্ণকান্তের উইল - ১৮৭৮।
৩. দেশাত্মবোধক উপন্যাস - ক) আনন্দমঠ - ১৮৮৪, খ) দেবী চৌধুরানী - ১৮৮৪।
৪. উপন্যাসিকা - ক) ইন্দিরা - ১৮৭৩, খ) রাধারানী - ১৮৮৬।
৫. মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস - ক) রজনী - ১৮৭৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল বাংলার ভাবজীবন। যে, জীবন পশ্চিমী হাওয়ায় ও আত্মবিকাশের তাগিদে খরস্রোত হয়ে উঠেছিল। সেই খরস্রোত ছিল না সাধারণের জীবনে, তখন শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধানও ছিল। তবুও যারা শিক্ষিত হয়েছিলেন তাদের আগ্রহে জন্ম নিল বাংলার নতুন জীবন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি সমাজের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তির সঙ্গে সংসারের দ্বন্দ্ব, হিন্দু-ব্রাহ্মের ভাবসংঘাত, রাজনীতি ও স্বদেশ প্রেম, ব্যক্তির অন্তর্মুখীনতা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক চেতনাকে সমগ্রতা দান করেছিল।

রবীন্দ্র উপন্যাস সরণি

১. করুণা (১৮৭৭ - ৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত), ২. বউঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩), ৩. রাজর্ষি (১৮৮৭), ৪. চোখের বালি (১৯০৩), ৫. নৌকাডুবি (১৯০৬), ৬. গোরা (১৯১০), ৭. চতুরঙ্গ (১৯১৬), ৮. ঘরেবাইরে (১৯১৬), ৯. যোগাযোগ (১৯২৯), ১০. শেষের কবিতা (১৯২৯), ১১. দুইবোন (১৯৩৩), ১২. মালঞ্চ (১৯৩৪), ১৩. চার অধ্যায় (১৯৩৪)

বাংলা ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ছোটোগল্প সাহিত্য যাঁর হাতে সার্থকভাবে জন্মলাভ করেছিল, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যা ছিল 'Short Story', বাংলায় তাই-ই হল ছোটোগল্প। বাংলা সাহিত্যের এই একমুখী, প্রচণ্ড গতিশীল, সমাপ্তিতে ব্যঞ্জনার সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ শাখাকে তিনি কেবল জন্মই দিলেন না, তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠাও দিয়ে গেলেন। বিষয়বস্তু, রচনাকৌশল এবং জীবনের বিশিষ্টস্তর ও যুগবৈশিষ্ট্যের বিচারে তাঁর ছোটোগল্প ভিন্নধর্মী।

গল্প সম্ভার

* প্রথম ছোটোগল্প - ভিখারিণী - ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

* মনস্তাত্ত্বিক ছোটোগল্প - দান প্রতিদান, সমস্যাপূরণ, ব্যবধান, সমাপ্তি, দুরাশা, দৃষ্টিদান, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, কাবুলিওয়ালা, ল্যাবরেটরি, রবিবার, শেষের রাত্রি, মানভঞ্জন, প্রায়শ্চিত্ত, মাল্যদান, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা।

* ঘটনা প্রধান ছোটোগল্প - আপদ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, পোস্টমাস্টার, গিন্নী।

* সমাজ সম্বন্ধীয় ছোটোগল্প - দেনা পাওনা, একরাত্রি, মাস্টার মশাই, ত্যাগ, মহামায়া, ঠাকুরদা, বিচারক, শুভদৃষ্টি, দিদি, ঠাকুরদা, হৈমন্তী, নষ্টনীড়, স্ত্রীরপত্র, অধ্যাপক, নামঞ্জুর, তিনসঙ্গী, শেষ কথা।

* গার্হস্থ্যধর্মী ছোটোগল্প - হালদার গোষ্ঠী, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি।

* অতি প্রাকৃত রহস্যময় ছোটোগল্প - গুপ্তধন, ক্ষুধিত পাষাণ, জীবিত ও মৃত, মনিহারা, নিশীথে, স্বর্ণমৃগ, সম্পত্তি সমর্পন, কঙ্কাল।

* রাজনৈতিক ছোটোগল্প - অনধিক প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র।

* হাস্যরসাত্মক ছোটোগল্প - মুক্তির উপায়, বহু পুরাতন গল্প, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, রীতিমত নভেল।

* ঐতিহাসিক ছোটোগল্প - দালিয়া।

* সাংস্কৃতিক ছোটোগল্প - জয় পরাজয়।

* প্রকৃতিপ্রেম ও নিসর্গচেতনামূলক ছোটোগল্প - বলাই, অতিথি, ছুটি, সুভা, আপদ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৩৮)

রবি যখন মধ্যগগনে তখন চন্দ্রের উদয় - বলাবাহুল্য সেই চন্দ্র; শরৎচন্দ্র। রবিতাপে ঝলসে গেল না শরৎচন্দ্রের স্বকীয়তা। ১৯০৩ - এ 'চোখের বালি' প্রকাশ আর ঐ একই সময়ে শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্প কুন্তলীন পুরস্কার পায়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অবলম্বিত পথ থেকে সরে এলেন শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র জানতেন, পরিবর্তনশীলতাই বিশ্বপ্রকৃতির বিষয়, গতিময়তাই এর প্রকৃতি, সমাজ, মানবজীবন, মানবমন - সবই নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে - এই পরিবর্তনের জোয়ারে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার রুচি, রসবোধ, প্রেম-ভালোবাসা সবই পালিয়ে যাচ্ছে - এটাই ক্রমোন্নতির পথ, উন্নত থেকে উন্নততর রূপ অর্জনের ঐতিহাসিক যাত্রাপথ। তাই সাহিত্য হল রসরূপে জীবই সুন্দরতম এবং যথার্থ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেছিলেন - 'শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবেই ছিলেন নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়'।

রচনা পঞ্জি

* উপন্যাস - 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'পরিণীতা' (১৯১৪), পন্ডিতমশাই (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), পল্লীসমাজ (১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত (প্রথম) (১৯১৭), দেবদাস (১৯১৭), নিষ্কৃতি (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), শ্রীকান্ত (দ্বিতীয়) (১৯১৮), বামুনের মেয়ে (১৯২০), গৃহদাহ (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), নববিধান (১৯২৪), পথের দাবী (১৯২৬), শ্রীকান্ত (তৃতীয়) (১৯২৭), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১), শ্রীকান্ত (চতুর্থ) (১৯৩৩), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫), শুভদা (১৯৩৮), শেষের পরিচয় (১৯৩৯)

* ছোটোগল্প - শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প 'মন্দির' যার জন্য কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দে। তারপর ১৯১৩ তে 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশের পর বাঙালি পাঠকসমাজ শরৎচন্দ্রের লেখা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে। এরপর 'যমুনা' পত্রিকায় 'রামের সুমতি' (ফাল্গুন - চৈত্র, ১৩১৯), 'পথনির্দেশ' (বৈশাখ, ১৩২০), 'বিন্দুর ছেলে' (শ্রাবণ, ১৩২০) প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁর গল্প লেখা নিয়ে নিজেই লিখেছেন, "আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়া গল্প লিখি। সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না"।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলো হল - 'মেজদিদি' (ভারতবর্ষ, ১৩২১ কার্তিক), দর্পচূর্ণ (ভারতবর্ষ, ১৩২১ মাঘ), 'আঁধারে আলো' (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২১), 'নিষ্কৃতি' (ভারতবর্ষ, ১৩২৩), 'কাশীনাথ' (সাহিত্য, ১৩১৯), 'অনুপমার প্রেম' (সাহিত্য, ১৩২৩), 'বাল্যস্মৃতি' (সাহিত্য, ১৩১৯), 'একাদশী বৈরাগী' (ভারতবর্ষ, ১৩২৪), 'বিলাসী' (ভারতী, ১৩২৫), 'মামলার ফল' (পার্বনী, ১৩২৫), 'হরিলক্ষ্মী' (বসুমতী, ১৩৩২), 'মহেশ' (বঙ্গবাণী, ১৩২৯), 'অভাগীর স্বর্গ' (বঙ্গবাণী, ১৩২৯) ইত্যাদি। গল্পগুলি বর্মায়, ভাগলপুরে, হাওড়ায় থাকাকালীন সময়ে রচনা করেছেন।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ - ১৯১৭)

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশিষ্ট নাম। তিনি সেকাল ও একালের ফুল নিয়ে কথাসাহিত্যের মালা গেঁথে পরিয়ে দিয়েছেন মহাকালের গলায়। একদিকে রয়েছে প্রচুর জীবনাভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে রয়েছে সাহিত্য রচনার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমাজ মনস্কতা এই দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করলেন আপন কথাসাহিত্যের পৃথিবী।

রচনা পঞ্জি

* উপন্যাস - চৈতালী ঘূর্ণি (১৯২৮), পাষাণ পুরী (১৯৩৩), নীলকণ্ঠ (১৯৩৩),

রাইকমল (১৯৩৬), প্রেম ও প্রয়োজন (১৯৩৬), আগুন (১৯৩৭), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪২), কবি (১৯৪২), মন্বন্তর (১৯৪৪), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), সন্দীপন পাঠশালা (১৯৪৬), ঝড় ও ঝরাপাতা (১৯৪৬), অভিযান (১৯৪৬), তামস তপস্যা (১৯৪৯), উত্তরায়ন (১৯৫০), পদচিহ্ন (১৯৫০), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৫১), নাগিনী কন্যার কাহিনি (১৯৫১), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩), চাঁপাডাঙার বউ (১৯৫৪), স্বর্গমর্ত্য (১৯৫৪), না (১৯৫৫), পঞ্চপুত্তলী (১৯৫৬), কালান্তর (১৯৫৬), বিচারক (১৯৫৬), সপ্তপদী (১৯৫৭), রাধা (১৯৫৭), ডাকহরকরা (১৯৫৮), মহাশ্বেতা (১৯৬০), যোগভ্রষ্ট (১৯৬০), নাগরিক (১৯৬০), বিপাশা (১৯৬০), নিশিপদ্ম (১৯৬১), যতিভঙ্গ (১৯৬২), কান্না (১৯৬২), কালবৈশাখী (১৯৬৩), একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে (১৯৬৩), জঙ্গলগড় (১৯৬৪), বসন্তরাগ (১৯৬৪), সুতপার তপস্যা (১৯৬৪), হীরাপান্না (১৯৬৫), গন্না বেগম (১৯৬৫), গুরুদক্ষিণা (১৯৬৬), অরণ্য বহ্নি (১৯৬৬), মঞ্জরী অপেরা (১৯৬৪), ভুবনেশ্বরের হাট (১৯৬৪), সংকেত (১৯৬৪), শঙ্কর বাঈ (১৯৬৭), শুকসারী কথা (১৯৬৭), মনি বউদি (১৯৬৭), নবদিগন্ত (১৯৭১), মহানগরী (১৯৭৫), কালরাত্রি (১৯৭০), ছায়াপথ (১৯৭১) ইত্যাদি।

* গল্পগ্রন্থ - ছলনাময়ী (১৯৩৬), জলসাঘর (১৯৩৭), রসকলি (১৯৩৮), তিন শূন্য (১৯৪১), প্রতিধ্বনি (১৯৪৩), বেদেনী (১৯৪৩), দিল্লী কা লাড্ডু (১৯৪৩), যাদুকরী (১৯৪৪), স্থলপদ্ম (১৯৪৪), তেরশ পঞ্চাশ (১৯৪৫), প্রসাদমালা (১৯৪৫), হারানো সুর (১৯৪৫), ইমারত (১৯৪৭), শ্রীপঞ্চমী (১৯৪৭), মাটি (১৯৫০), শিলাসন (১৯৫২), কামধেনু (১৯৫৩), বিস্ফোরণ (১৯৫৫), কালান্তর (১৯৫৬), বিষপাথর (১৯৫৭), মানুষের মন (১৯৫৮), রবিবারের আসর (১৯৫৮), পৌষলক্ষ্মী (১৯৬০), আলোকাভিসার (১৯৬০), চিরন্তনী (১৯৬২), অ্যাক্সিডেন্ট (১৯৬২), তমসা (১৯৬৩), চিন্ময়ী (১৯৬৪), তপোভঙ্গ (১৯৬৬), দীপার প্রেম (১৯৬৬), জায়া (১৯৬৭), পঞ্চকন্যা (১৯৬৭), শিবানীর অদৃষ্ট (১৯৬৭), এক পশলা বৃষ্টি (১৯৬৭), রূপসী বিহঙ্গিনী (১৯৭০)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৯৫০)

বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন 'বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী'-র অন্যতম উপন্যাসকার ও গল্পকার। অন্যান্য উপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন প্রকৃতি প্রীতির অসাধারণ নিদর্শন রাখার জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের ভাঙতে থাকা মূল্যবোধ, অপরিসীম দুঃখ-বেদনা, পরাজিত মানবাত্মার অমর গৌরব গাথা তাঁর দ্বারা রচিত হল সহজ ভাষায় সাবলীলতায়।

রচনা পঞ্জি

* উপন্যাস - পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩২), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৯), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), বিপিনের সংসার (১৯৪১), দুই বাড়ি (১৯৪১), অনুবর্তন (১৯৪২), দেবযান (১৯৪৪), কেদার রাজা (১৯৪৫), অথৈজল (১৯৪৭), ইচ্ছামতী (১৯৫০), দম্পতি (১৯৫২), অশনি - সংকেত (১৯৫৯)

* শিশু সাহিত্য - চাঁদের পাহাড় (১৯৩৭), মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০), মিসমিদের কবচ (১৯৪২) তালনবমী (১৯৪৪), হীরামানিক জ্বলে (১৯৪৬)

* গল্পগ্রন্থ সরণি - মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭), কিন্নর দল (১৯৩৮), বেণীগীর ফুল বাড়ি (১৯৪১), নবাগত (১৯৪৪), উপলখন্ড (১৯৪৪), বিধুমাস্টার (১৯৪৫), ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫), অসাধারণ (১৯৪৬), মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭), নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব (১৯৪৮), জ্যোতিরিঙ্গণ (১৯৪৯), কুশল পাহাড়ী (১৯৫০), রূপ হলুদ (১৯৫৭), ছায়াছবি (১৯৬০), অনুসন্ধান (১৯৬০)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ - ১৯৫৬)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের বাস্তবভূমিতে পদচারণা করে, বাস্তবের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছেন। সেজন্য তথাকথিত রোমান্টিকতা পরিত্যাগ করে মানিক বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানদৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তির পতনের কারণগুলিকে অনুসন্ধান করে তাকে তাঁর কথাসাহিত্যে রূপায়নের চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে তিনি দুঃসাহসী লেখক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সরণি

১. জননী (১৯৩৫), ২. দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), ৩. পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), ৪. পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), ৫. জীবনের জটিলতা (১৯৩৬), ৬. অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮), ৭.শহরতলী (১ম - ১৯৪০, ২য় - ১৯৪১), ৮. অহিংসা (১৯৪১), ৯. ধরা বাঁধা জীবন (১৯৪১), ১০. প্রতিবিম্ব (১৯৪৩), ১১. দর্পণ (১৯৪৫), ১২. শহরবাসের ইতিহাস (১৯৪৬), ১৩. চিন্তামণি (১৯৪৬), ১৪. চিহ্ন (১৯৪৭), ১৫. আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭), ১৬. চতুষ্কোণ (১৯৪৮), ১৭. জীয়ন্ত (১৯৫০), ১৮. পেশা (১৯৫১), ১৯. স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), ২০. সোনার চেয়ে দামী [১ম খন্ড - বেকার (১৯৫১), ২য় খন্ড - আপোষ (১৯৫২)], ২১. ছন্দপতন (১৯৫১), ২২. ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), ২৩.

পাশাপাশি (১৯৫২), ২৪. সার্বজনীন (১৯৫২), ২৫.আরোগ্য (১৯৫৩), ২৬. তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩), ২৭. নাগপাশ (১৯৫৩), ২৮.চালচলন (১৯৫৩), ২৯. শুভাশুভ (১৯৫৪), ৩০. হরফ (১৯৫৪), ৩১. পরাধীন প্রেম (১৯৫৫), ৩২. হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬), ৩৩. প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (১৯৫৬), ৩৪. মাটি ঘেঁষা মানুষ, 'চাষীর মেয়ে ও কুলীর বউ' (১৯৫৭), ৩৫. শান্তিলতা (১৯৬০), ৩৬. মাঝির ছেলে (১৯৬০) ইত্যাদি।

গল্পগ্রন্থের সরণি

১. অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), ২. প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), ৩. মিহি ও মোটা কাহিনি (১৯৩৮), ৪. সরীসৃপ (১৯৩৯), ৫. বৌ (১৯৪০), ৬. সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ৭.ভেজাল (১৯৪৪), ৮. হলুদপোড়া (১৯৪৫), ৯. আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), ১০. পরিস্থিতি (১৯৪৬), ১১. ছোট বড় (১৯৪৮), ১২. মাটির মাশুল (১৯৪৮), ১৩. ছোটো বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), ১৪.মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০), ১৫. ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), ১৬. লাজুকলতা (১৯৫৪), ১৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫০), ১৮. গল্পসংগ্রহ (১৯৫৭), ১৯.ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৮), ২০. উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ (১৯৬৩), ২১. কিশোর বিচিত্রা (১৯৬৮) ইত্যাদি।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : মান – ১

১. রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রাকৃত গল্পের নাম লেখো।

উত্তর - রবীন্দ্রনাথের একটি অতি প্রাকৃত গল্পের নাম হল - 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

২. বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসটির নাম কী?

উত্তর - বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসটির নাম হল - 'রাজসিংহ'।

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা কয়টি?

উত্তর - বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা মোট চোদ্দোটি।

৪. বঙ্কিমচন্দ্রের "Rajmohan's Wife" রচনাটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

উত্তর - বঙ্কিমচন্দ্রের "Rajmohan's Wife" রচনাটি Indian Field পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫. রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ও মিস্টিক উন্যাসগুলির নাম লেখো।

উত্তর - রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ও মিস্টিক উন্যাসগুলোর নাম - 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) এবং 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)।

৬. রবীন্দ্রনাথের দুটি দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাসের নাম লেখো।

উত্তর - রবীন্দ্রনাথের দুটি দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাসের নাম হল - 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)।

৭. রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যিক উপন্যাসটির নাম লেখো।

উত্তর - রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যিক উপন্যাস হল 'গোরা'। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে।

৯. শরৎচন্দ্রের জীবিত কালে শেষ উপন্যাসটির নাম লেখো।

উত্তর - শরৎচন্দ্রের জীবিত কালে শেষ উপন্যাসটির নাম হল - 'বিপ্রদাস'।

১০. শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটির নাম কি?

উত্তর - শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটির নাম হল - 'শ্রীকান্ত'।

১১. শরৎচন্দ্রের দুটি ছোটোগল্পের নাম কি?

উত্তর - শরৎচন্দ্রের দুটি ছোটোগল্পের নাম হল - 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো'।

১২. বিভূতিভূষণের দুটি বিশিষ্ট উপন্যাসের নাম লেখো।

উত্তর - বিভূতিভূষণের দুটি বিশিষ্ট উপন্যাসের নাম - 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'।

১৩. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর - 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম কী?

উত্তর - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা কোনটি?

উত্তর - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা - 'অতসী মামী'।

১৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্ উপন্যাসের জন্য 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' লাভ করেন?

উত্তর - 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' লাভ করেন।

নিজে করো ঃ **মান-১**

১৭. 'কমলাকান্তের দপ্তর' কার লেখা?

উত্তর -

১৮. শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটির নাম কী?

উত্তর -

১৯. 'বাংলার স্কট' কাকে বলা হয়?

উত্তর -

২১. শরৎচন্দ্র কোন্ গল্পটি লিখে 'কুন্তলীন' পুরস্কার পান?

উত্তর -

২১. ত্রিপুরার কাহিনি নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাসের নাম কী?

উত্তর -

২২. 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটির লেখক কে?

উত্তর -

২৩. 'জলসা ঘর' কে রচনা করেন?

উত্তর -

২৪. কোন্ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকা আছে?

উত্তর -

২৫. 'দেবদাস' কার লেখা?

উত্তর -

২৬. রবীন্দ্রনাথ মোট কয়টি উপন্যাস লিখেছেন?
উত্তর -

২৭. বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা দুটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের নাম লেখো।
উত্তর -

২৮. রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম উপন্যাসটির নাম কী?
উত্তর -

২৯. রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ছোটোগল্পটির নাম লেখো।
উত্তর -

৩০. রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি রাজনৈতিক উপন্যাসের নাম লেখো।
উত্তর -

৩১. শরৎচন্দ্রের রচিত একটি পারিবারিক উপন্যাসের নাম লেখো।
উত্তর -

৩২. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসটির নাম কী?
উত্তর -

৩৩. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম কী?
উত্তর -

৩৪. 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি কয়টি পর্বে / খন্ডে রচিত?
উত্তর -

৩৫. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় কোন্ পত্রিকায়?
উত্তর -

৩৬. 'চোখের বালি' উপন্যাসটি কার লেখা?
উত্তর -

৩৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
উত্তর -

৩৮. কোন উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত রয়েছে?
উত্তর -

৩৯. বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রথম ও সার্থক স্রষ্টা কে?
উত্তর -

৪০. 'গোরা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
উত্তর -

৪১. 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির লেখক কে?
উত্তর -

৪২. 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' কার লেখা?
উত্তর -

৪৩. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাসটির নাম কী?
উত্তর -

৪৪. বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম লেখো।
উত্তর -

৪৫. 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ কী?
উত্তর -

৪৬. 'আরণ্যক' উপন্যাসটি কার লেখা?
উত্তর -

৪৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটির নাম কী?
উত্তর -

৪৮. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম ছোটোগল্পটির নাম কী?
উত্তর -

৪৯. কোন্ উপন্যাসের জন্য তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান?
-উত্তর -

৫০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসটির নাম লেখো।
উত্তর -

৫১. 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী' ছোটোগল্পটির রচয়িতা কে?
উত্তর -

৫২. বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসটির নাম কী?
উত্তর -

৫৩. রবীন্দ্রনাথের একটি সমাজ সমস্যামূলক গল্পের নাম কী?
উত্তর -

৫৪. রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় কোন্ উপন্যাস রচনা করেন?
উত্তর -

৫৫. রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পের নাম কী?
উত্তর -

৫৬. গ্রন্থ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কোন্টি?
উত্তর -

৫৭. শরৎচন্দ্রের রচিত প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস কোন্‌টি?
উত্তর -

৫৮. শরৎচন্দ্রের রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসটির নাম কী?
উত্তর -

৫৯. শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম কী?
উত্তর -

৬০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম রচনা কোন্‌টি?
উত্তর -

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো : **মান– ৬**

১. বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান আলোচনা করো।
উত্তর - বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প উত্তরণের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অবিস্মরণীয়। ছোটোগল্পের স্বরূপ ধর্ম ও রূপকল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনারতরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় খুবই সুন্দর অথচ স্পষ্ট করে বলেছেন -

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল।
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘন ঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইলনা শেষ।

ছোটোগল্পের এই ছন্দোবদ্ধ সংজ্ঞায় এর বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস, নাটকীয় ঘটনায় আকস্মিকতা, গীতিকবিতায় তন্ময়তা এবং সম্পত্তির সাংকেতিক ব্যঞ্জনা ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্যই বিধৃত।

কবির সৃজনশীল মন ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে দারুণভাবে সহযোগিতা করেছিল। তাঁর রচিত গল্পসমূহ বলতে 'একরাত্রি', 'দুরাশা', 'শেষের রাত্রি', 'মধ্যবর্তিনী প্রেম' সৌন্দর্য ও কল্পনার বিস্ময়কর সমন্বয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। পারিবারিক জীবনে স্নেহ, প্রেমের

সম্বন্বয় ঘটেছে। 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'রাসমনির ছেলে', 'ছুটি', 'দিদি', 'ঠাকুরদা' এবং 'নষ্টনীড়'। তবে 'নষ্টনীড়' গল্পটি অন্যান্য ছোটোগল্পের তুলনায় একটু দীর্ঘ। মেঘ ও রৌদ্র, অতিথি, আপদ গল্পের প্রকৃতি ও মানবের অন্তগূঢ়, যোগাযোগের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। কবিগুরুর দৃষ্টি সর্বদাই স্বচ্ছ ছিল। ভালোবাসার দৃষ্টির নিরিখে পল্লিগ্রামকে, পল্লির মানুষকে অবলোকন করেছেন। রবিবার, ল্যাবরেটরি ও শেষরক্ষা গল্প সমূহে আধুনিক জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যাকে কবিগুরু রসসৌন্দর্যতা দান করেছেন।

এছাড়া রামকানাই এর নির্বুদ্ধিতা, দান, প্রতিদান, ব্যবধান, পণরক্ষা, শান্তি, পুত্রযজ্ঞ, ফেল, গুপ্তধন, স্ত্রীরপত্র, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি গল্প সমাজ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

পরিশেষে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যে পথের পথিক ছিলেন পরবর্তীকালে সাহিত্যিকরা সে পথ ধরে আরও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এগিয়ে গেছে। তাঁর অজস্র ছোটোগল্পে বাংলা সাহিত্যকে অপূর্ব সম্পদে বলিয়ান করে তুলেছেন। আর এই কারণেই রবীন্দ্র প্রতিভা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে আজও সমাদৃত।

২. বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উত্তর :

৩. বাংলা কথা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৬

উত্তর :

৪. বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচনায় তারাশঙ্করের অবদান মূল্যায়ন করো। ৬

উত্তর :

৫. বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্পে শরৎচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৬

উত্তর :

৬. বাংলা উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

উত্তর :

৭. রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর :

*****

একক – ৫

ধ্বনি তত্ত্ব

ভূমিকা

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত শব্দের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশকে ধ্বনি বলে।

ধ্বনি দুই প্রকার - স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। আর ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়। স্বরধ্বনির অবস্থান অনুযায়ী ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি অনুসারে স্বরাগম, স্বরলোপ, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, স্বরসংগতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নজরে আসে। আর ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান অনুসারে ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যঞ্জনলোপ, ব্যঞ্জনাগম, সমীভবন, বিষমীভবন, নাসিক্যীভবন, ধ্বনি বিপর্যয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হতে পারে।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্য স্বরাগম — মান– ৬

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে বিশেষত উচ্চারণের কাঠিন্য লাঘব করতে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ভেঙ্গে মাঝখানে যে স্বরধ্বনি এসে উচ্চারিত হয়, তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

উদাহরণ ঃ যত্ন > যতন

বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে পাই -

যত্ন = য + অ + ত্ + ন + অ > যতন = য + অ + ত + অ + ন্

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল 'যত্ন' নামক শব্দের মধ্যে 'ত্ন' নামক ভিন্নধর্মী যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝে 'অ' নামক স্বরধ্বনি এসে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী এটি একটি উৎকৃষ্ট স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের উদাহরণ হয়েছে। যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝে স্বরধ্বনির আগমন হয়েছে বলে এই রীতিকে মধ্যস্বরাগমও বলা হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্ত ঃ ধর্ম > ধরম, কর্ম > করম, জন্ম > জনম, মুক্তা > মুকুতা

অপিনিহিতি

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির পরে থাকা 'ই' বা 'উ' নামক স্বরধ্বনি যদি ওই ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত পূর্বে এসে উচ্চারিত হয়, তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বাংলা ব্যাকরণে অপিনিহিতি বলে।

উদাহরণ ঃ রাখিয়া > রাইখ্যা

বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উদাহরণটি বিশ্লেষণপূর্বক দেখি

রাখিয়া = র + আ + খ + ই + য় + আ > রাইখ্যা = র + আ + ই + খ + য(্য) + আ

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল 'রাখিয়া' নামক শব্দের মধ্যে 'খ' নামক ব্যঞ্জনধ্বনির পরে থাকা 'ই' নামক স্বরধ্বনি ওই 'খ' এর-ই অব্যবহিত পূর্বে এসে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী এটি একটি উৎকৃষ্ট অপিনিহিতি নামক ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ

ই

বসিয়া > বইস্যা, বানিয়া > বাইন্যা, ডুবিয়া > ডুইব্যা,

উ

সাধু > সাউধ, মাছুয়া > মাউচ্ছ্যা, গাছুয়া > গাউছ্যা,

অভিশ্রুতি

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে বিশেষত উচ্চারণের সময় সংক্ষিপ্তকরণ ও কাঠিন্য দূরীকরণে শব্দের মধ্যে অপিনিহিতিজাত কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির আগে এসে উচ্চারিত হওয়া 'ই' বা 'উ' নামক স্বরধ্বনি যদি পাশাপাশি বা কাছাকাছি অন্যকোনো স্বরধ্বনির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সন্ধির ফলে নতুন স্বরধ্বনি সৃষ্টি করে উচ্চারিত হয়, তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে অভিশ্রুতি বলে।

উদাহরণ ঃ ১) রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে ২) দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে

৩) গাছুয়া > গাউছ্যা > গেছো ৪) করিয়া > কইর‍্যা > করে

বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে পাই -

২) দেখিয়া = দ + এ + খ + ই + য় + আ

দেইখ্যা = দ + এ + ই + খ + য(্য) + আ

দেখে = দ + এ + খ + এ

৪) করিয়া = ক + অ + র + ই + য় + আ

কইর‍্যা = ক + অ + ই + র + য(্য) + আ

করে = ক + অ + র + এ

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল 'করিয়া' নামক শব্দটি অপিনিহিতি নামক ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রে কইর‍্যা হয়েছে। 'র' নামক ব্যঞ্জনধ্বনির পরে থাকা 'ই' নামক স্বরধ্বনি অপিনিহিতিজাত হয়ে ওই 'র' এরই পূর্বে এসে বসেছে এবং 'আ' নামক পাশাপাশি থাকা স্বরধ্বনির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সন্ধির ফলে 'এ' নামক নতুন স্বরধ্বনির সৃষ্টি করে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং, নিময় অনুযায়ী এটি একটি উৎকৃষ্ট অভিশ্রুতির উদাহরণ।

দৃষ্টান্ত ঃ বাদিয়া > বাইদ্যা > বেদে, মাটিয়া > মাইট্যা > মেটে,

বাছিয়া > বাইছ্যা > বেছে, বলিয়া > বইল্যা > বলে

স্বরসঙ্গতি

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে বিশেষত উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যে পাশাপাশি থাকা দুটি ভিন্নধর্মী স্বরধ্বনি যদি একে অপরের প্রভাবে বা পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সংগতি বিধানের জন্য একই ধরনের স্বরধ্বনিতে পরিণত হয় তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে স্বরসঙ্গতি বলে।

উদাহরণ ঃ দেশি > দিশি

বিশ্লেষণ ঃ উপরের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে পাই -

দেশি = দ + এ + শ + ই, > দিশি = দ + ই + শ + ই

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল - 'দেশি' নামক শব্দের ভেতরে 'এ' এবং 'ই' নামক ভিন্নধর্মী স্বরধ্বনির পাশাপাশি সহাবস্থান। এখানে পূর্ববর্তী 'এ' পরবর্তী 'ই' কারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে 'ই' কারে পরিবর্তিত হয়ে সংগতি বজায় রেখেছে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী এটি স্বরসংগতির উদাহরণ হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ বিলাতি > বিলিতি, শুনানি > শুনুনি, ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি

সমীভবন

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে বিশেষত উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অশিক্ষাজনিত কারণে শব্দের মধ্যে যুক্ত অবস্থায় থাকা বা সন্নিহিত তথা পাশাপাশি অবস্থায় থাকা দুটি ভিন্নধর্মের ব্যঞ্জনধ্বনি যদি পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে একই রকম ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয় তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে সমীভবন বা সমীকরণ বা ব্যঞ্জনসংগতি বলে।

উদাহরণ ঃ পদ্ম > পদ্দ

বিশ্লেষণ ঃ উপরের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে পাই -

পদ্ম = প + অ + দ্ + ম + অ > পদ্দ = প + অ + দ্ + দ + অ

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল - 'পদ্ম' নামক শব্দের ভেতরে 'দ' এবং 'ম' নামক ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্ত অবস্থান। এখানে 'দ' এর প্রভাবে 'ম' নামক ব্যঞ্জনধ্বনিটিও একই বা সমধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি 'দ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং, নিয়ম অনুযায়ী এটি একটি সমীভবন বা সমীকরণ বা ব্যঞ্জনসংগতির উদাহরণ হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ চন্দন > চন্নন, চক্র > চক্ক, ধর্ম > ধম্ম, তর্ক > তক্ক,

গল্প > গপ্প, নাতজামাই > নাজ্জামাই

স্বরাগম

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে যদি কোনো স্বরধ্বনির আগম হয়ে উচ্চারণ হয় তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে স্বরাগম বলে।

উদাহরণ ঃ স্টিমার > ইস্টিমার

বিশ্লেষণ ঃ উপরের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে পাই -

স্টিমার = স্ + ট + ই + ম + আ + র্ > ইস্টিমার = ই + স্ + ট + ই + ম + আ + র্

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল 'স্টিমার' নামক শব্দের আদিতেই 'স্ট' নামক যুক্ত

ব্যঞ্জনধ্বনির আগে 'ই' নামক স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী এটি (আদি) স্বরাগমের উদাহরণ হয়েছে।

স্বরাগম তিন প্রকার -

১. আদি স্বরাগম ঃ শব্দের আদিতে স্বরের আগম হলে তাকে বলা হয় আদি স্বরাগম।

উদাহরণ - স্ত্রী > ইস্তিরি, স্টেসন > ইস্‌টেসন, স্কুল > ইস্কুল

২. মধ্য স্বরাগম ঃ শব্দের মধ্যে স্বরের আগম হলে তাকে বলা হয় মধ্য স্বরাগম।

উদাহরণ - বার্তা > বারতা, স্বপ্ন > স্বপন, নয়ন > নয়ান, কর্ম > করম

৩. অন্ত্য স্বরাগম ঃ শব্দের শেষে স্বরের আগম হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে।

উদাহরণ - সত্য > সত্যি, মিষ্ট > মিষ্টি, ধন্য > ধন্যি

নাসিক্যীভবন

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে শব্দের মধ্যে অবস্থিত নাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় এবং পরিবর্তে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি যদি সানুনাসিক হয়ে উচ্চারিত হয় তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে নাসিক্যীভবন বলে।

উদাহরণ ঃ বন্ধ > বাঁধ

বিশ্লেষণ ঃ উপরের উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে পাই -

বন্ধ = ব + অ + ন্ + ধ + অ, > বাঁধ = ব + আঁ + ধ্

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল - 'বন্ধ' নামক শব্দের মধ্যে 'ন' নামক নাসিক্য ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি 'আ' সানুনাসিক হয়ে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী এটি নাসিক্যীভবনের উদাহরণ হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ শঙ্খ > শাঁখ, অঙ্ক > আঁক, পঞ্চ > পাঁচ, অঞ্চল > আঁচল

ধ্বনি লোপ

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে কোনো শব্দ থেকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অভ্যাসজনিত কারণে কোনো স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়ে উচ্চারিত হয় তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে ধ্বনি লোপ বলে।

উদাহরণ ঃ কলিকাতা > কলকাতা

বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উদাহরণে শব্দের মাঝে 'ই' নামক স্বরধ্বনি লোপ পেয়েছে।

স্বরলোপ ঃ

*** আদি স্বরলোপ (Aphesis) ঃ** শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে আদি স্বরলোপ বলে।

ওঝা > ঝা, অতসী > তিসি, অপিধান > পিধান

*** মধ্য স্বরলোপ (Syncope) ঃ** শব্দের মধ্যবর্তী স্বর লুপ্ত হলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে।

কলিকাতা > কলকাতা, গামোছা > গামছা,

ভগিনী > ভগ্নী, কাঁচাকলা > কাঁচকলা

*** অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope) ঃ** শব্দের শেষে স্বর লোপ পেলে তাকে অন্ত্য স্বরলোপ বলে।

অগ্র > আগ, রাতি > রাত, পোকা > পোক

ব্যঞ্জনলোপ ঃ

*** আদি ব্যঞ্জনলোপ ঃ** স্থিতু > থিতু, স্থান > থান, গ্রাহক > গাহক

*** মধ্য ব্যঞ্জনলোপ ঃ** ফলাহার > ফলার, শৃগাল > শিয়াল, মজদুর > মজুর

*** অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ ঃ** গাত্র > গা, কুটুম্ব > কুটুম, আলোক > আলো

বিষমীভবন

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে কোনো শব্দের মধ্যে থাকা দুটি সমবর্ণের ব্যঞ্জনধ্বনি তথা দুটি একই ব্যঞ্জনধ্বনির যে-কোনো একটি অন্য বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে উচ্চারিত হলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বলে বিষমীভবন।

উদাহরণ ঃ লাল > নাল

বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে পাই -

লাল = ল + আ + ল্, > নাল = ন + আ + ল্

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল - 'লাল' নামক শব্দের মধ্যে পাশাপাশি থাকা দুটি একই ব্যঞ্জনবর্ণ হল 'ল'। এই একই বর্ণের একটি পরিবর্তিত হয়ে 'ন'-তে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সম থেকে বিষম হওয়াতে এটি বিষমীভবনের উদাহরণ হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ লাঙ্গল > নাঙ্গল, শরীর > শরীল।

লোকনিরুক্তি

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে কোনো বিদেশি বা অপরিচিত বা দুরুচ্চার্য শব্দ যদি পরিচিত কোনো শব্দের অল্পবিস্তর ধ্বনি সাদৃশ্য নিয়ে সমরূপতায় উচ্চারিত হয়, তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বলে লোকনিরুক্তি।

উদাহরণ ঃ ঊর্নবাভ > ঊর্ননাভ, হসপিটাল > হাসপাতাল

বিশ্লেষণ ঃ সংস্কৃতে 'ঊর্নবাভ' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'যে জাল বয়ন করে'। 'ঊর্ন' কথাটির অর্থ হল 'জাল'। 'বভ' ধাতুটির অর্থ হল 'বয়ন' করা। পরবর্তী সময়ে লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে 'ঊর্নবাভ' শব্দটি 'ঊর্ননাভ' হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্ত ঃ আর্মচেয়ার > আরাম চেয়ার, টাকার কুবের > টাকার কুমির

বর্ণ বিপর্যয়

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে বিশেষত অজ্ঞতা বা অশিক্ষাজনিত কারণে মানুষের উচ্চারণরীতিতে শব্দের মধ্যে যুক্ত অবস্থায় বা পাশাপাশি অবস্থায় থাকা ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি যদি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে উচ্চারিত হয় তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বর্ণ বিপর্যয় বলে।

উদাহরণ ঃ রিক্সা > রিক্সা

বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে পাই -

রিক্সা = র + ই + ক্ + স + আ > রিক্সা = র + ই + স্ + ক + আ

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশে দেখা গেল 'রিক্সা' নামক শব্দের মধ্যে 'ক' এবং 'স' নামক দুটি ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত অবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু উচ্চারণের সময় এই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেই উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী এটি একটি বর্ণ / ধ্বনি বিপর্যয় বা বিপর্যাসের উদাহরণ হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ বাতাসা > বাসাতা, বাক্স > বাস্ক, তলোয়ার > তরোয়াল,

বারানসী > বানারসী, আল্না > আন্লা

বর্ণদ্বিত্ব

সংজ্ঞা ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মে বিশেষত অর্থের গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য শব্দ মধ্যস্থ কোনো ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে উচ্চারণ করা হয়, ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বর্ণদ্বিত্ব বলে।

উদাহরণ ঃ পাকা > পাক্কা

বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উদাহরণটি বিশ্লেষণ করে পাই -

পাকা = প + আ + ক + আ > পাক্কা = প + আ + ক্ + ক + আ

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্লেষিত অংশ থেকে বোঝা গেল 'পাকা' নামক শব্দের মধ্যে 'ক' নামক ব্যঞ্জনবর্ণটি দ্বিত্ব হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। মূলত 'পাক্কা' শব্দটির দ্বারা একবারেই সঠিক সিদ্ধান্ত বোঝানো হয়েছে। তাই এটি বর্ণদ্বিত্বের উদাহরণ হয়েছে। **দৃষ্টান্ত ঃ** সকাল > সক্কাল, সবাই > সব্বাই, মুলুক > মুল্লুক

প্রশ্নাবলী

১. সমীভবন কাকে বলে? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও। ৩

উত্তর :

২. বর্ণবিপর্যয় বলতে কি বোঝ?

উত্তর ঃ

৩. লোকনিরুক্তি কি?

উত্তর ঃ

৪. অপিনিহিতির সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ

৫. বিষমীভবনের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ

৬. বর্ণদ্বিত্ব বলতে কি বোঝ?

উত্তর ঃ

৭. নাসিক্যীভবন বলতে কি বোঝ?

উত্তর ঃ

*****

একক – ৫

ছন্দ

ছন্দের স্বরূপ - (জীবেন্দ্র সিংহ রায়)

কাব্যের রসঘন ও শ্রুতি মধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনি বিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাকে ছন্দ বলে। (Metre)

ছন্দ সমস্ত সুকুমার শিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ। মনুষ্য জগতে নদীর পদক্ষেপে ও অঙ্গ-সঞ্চালনে, চিত্রশিল্পীর তুলির আঁচড়ে যন্ত্রীর বাদনক্রিয়ায় ছন্দ থাকে। প্রকৃতি জগতে ও ছন্দের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। নদীর ঢেউয়ে, মৃদুমন্দ হাওয়ায় আন্দোলিত গাছের পাতায়, আকাশে উড্ডীয়মান পাখির পাখায় তার নিদর্শন আছে। তবে ছন্দ কোথাও দৃষ্টিগ্রাহ্য গতি সৌন্দর্য আবার কোথাও শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি সৌন্দর্য। কাব্যশিল্পের ছন্দ বলতে বোঝায় শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি সৌন্দর্য। এই ছন্দ বা শ্রুতি সৌন্দর্য গদ্যেরও হতে পারে।

ছন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন গুণী মানুষ বিভিন্ন মতপ্রকাশ করেছেন;

১. **প্রবোধ চন্দ্র সেন ঃ** "সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্য বিণ্যাসের নাম ছন্দ।"

২. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ** "বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতি মধুর হয় তাহার মধ্যে কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।"

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ "আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধো। কিন্তু একে বলে বাইরের বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারে তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার। ব্যথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের যে ছিলা কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।"

৪. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ "যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।"

৫. ছান্দোগ্য উপনিষদ ঃ "ছন্দসাং মন্ত্রার্নাং ছাদনাচ্ছাদস্বম্।"

ছন্দের উপকরণ

অক্ষর বা দল (Syllable)

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা একঝোঁকে শব্দের যে হ্রস্বতম অংশ উচ্চারিত হয়; তাকে অক্ষর বা দল বলে। শব্দের সেই হ্রস্বতম অংশ হচ্ছে অ-ব্যঞ্জন বা স-ব্যঞ্জন একটি স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করা যায় না, তাই স্বরধ্বনিহীন ব্যঞ্জনধ্বনি কখনও অক্ষর হতে পারে না।

অক্ষর বা দল দুই প্রকার - স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্ত দল বা মুক্তাক্ষর

ও

ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর

স্বরান্ত অক্ষর ঃ যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে; তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে।

উদাহরণ ঃ পরিভাষা - (প্ + অ) + (র্ + ই) + (ভ্ + আ) + (ষ্ + আ)

এখানে প্রত্যিকটি অক্ষরের শেষেই (অক্ষরগুলো বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে) একটি স্বরধ্বনি আছে। সুতরাং সংজ্ঞানুযায়ী চারটি অক্ষরই স্বরান্ত।

ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ঃ যে অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে।

উদাহরণ ঃ গাছ - (গ্ + আ + ছ্) এই অক্ষরটির শেষে 'ছ' ব্যঞ্জনধ্বনি আছে।

সুতরাং অক্ষরটি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

ছেদ ও যতি ঃ 'ছেদ' কথার অর্থ 'বিরতি', আবার 'যতি' কথার অর্থ হল 'বিরতি'। অর্থের প্রয়োজনে বাগ্‌যন্ত্রের যে বিরাম বা বিশ্রাম প্রয়োজন হয় তাকে বলে ছেদ বা অর্ধ যতি।

সুতরাং বলা যায় - কোনো বাক্য পড়বার সময় তার সমগ্র বা আংশিক অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য ধ্বনি প্রবাহে যে উচ্চারণ বিরতি দেওয়া হয় তাকেই ছেদ বলে। অল্পবিরতির চিহ্ন হিসেবে বসে কমা (,) এবং দীর্ঘ বিরতির চিহ্ন হিসেবে পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি (।) বসে।

বাক্যের মধ্যে অর্থের ক্রম ও গঠন অনুযায়ী মাঝে মাঝে কম বেশি বিরতি নিতে হয় কিংবা স্বরের উঁচু নীচু ঢেউ তুলতে যে বিশেষ ধরনের চিহ্ন বসানো হয় তাই-ই হল ছেদ বা যতি। এই সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র যথার্থই বলেছেন -

'কমা' পেলে একটু থেমে
'দাঁড়ি' পেলে দাঁড়াই,
'কোলন' 'সেমিকোলন' পেলে
জিরিয়ে পা বাড়াই।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় এর মতে - "কোন বাক্য পড়িবার সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য সুপরিকল্পিত কালান্তরে যে উচ্চারণ বিরতি আবশ্যক হয় তাহাকে যতি বা ছন্দ যতি হবে।"

উদাহরণ ঃ বাঁশ : বাগানের / মাথার : উপর / চাঁদ : উঠেছে / ওই /

যতি পাঁচ প্রকার ঃ

ক) পূর্ণযতি-I, খ) অর্ধযতি-II, গ) লঘুযতি-I, ঘ) উপযতি-:, ঙ) দল যতি-.

মাত্রা ঃ একটি অক্ষর বা দল উচ্চারণের যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাকে মাত্রা বা কলা বলে।

১. **তারাপদ ভট্টাচার্যের** মতে - "অক্ষরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাত্রা।"

২. **প্রবোধচন্দ্র সেন** - "যে-কোনো বস্তু পরিমাপের আদর্শ মানকে বলা হয় মাত্রা।" তিনিই আবার এর নাম দিয়েছিলেন 'কলা'।

৩. **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী** - 'কবিতার এক-একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে যে ধ্বনি প্রবাহ থাকে এবং তাকে উচ্চারণ করার জন্য মোট যে সময় আমরা নিয়ে থাকি; সেই উচ্চারণ কালের ক্ষুদ্রতম এক-একটি অংশই হল মাত্রা।'

এই মাত্রা স্বরান্ত অক্ষর এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন রকম হয়। যেমন-

ক) **দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ ঃ** স্বরান্ত অক্ষর = ১ মাত্রা,
ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর = ১ মাত্রা

খ) **কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঃ** স্বরান্ত অক্ষর = ১ মাত্রা,
ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর = ২ মাত্রা

গ) **মিশ্রবৃত্ত বা অক্ষবৃত্ত ছন্দ ঃ** স্বরান্ত অক্ষর = ১ মাত্রা এবং ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর যদি শব্দের আদিতে বা মাঝে থাকে তাহলে ১ মাত্রা ও শব্দের শেষে থাকলে বা একক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর হলে ২ মাত্রা হবে।

উদাহরণ ঃ

১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১১ ১

ক) বাঁশ বাগানের / মাথার উপর / চাঁদ উঠেছে / ওই /

১১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১

মাগো আমার / শোলক বলা / কাজলা দিদি / কই / - স্বরবৃত্ত ছন্দ

১১১ ১ ২ ১২ ১২ ২১ ১১ ১ ২১

খ) আজিকে যতেক / বনস্পতির / ভাগ্য দেখি যে / মন্দ / - মাত্রাবৃত্ত

১১ ২ ১১ ১১ ২ ১১ ১১

গ) আমাদের দেশে হবে / সেই ছেলে কবে।/

১ ২ ১ ১১ ১১ ১ ১ ১১ ১১

কথায় না বড় হয়ে / কাজে বড় হবে ॥/

পর্ব ঃ কোনো বাক্যের (কবিতার) যতটুকু অংশ এক-একটা ঝোঁকে পড়া হয়, সেই অংশটুকুকে বলা হয় পর্ব। অর্থাৎ এক হ্রস্ব-যতি থেকে আরেক হ্রস্ব যতি পর্যন্ত বাক্যের যে অংশ তাকে পর্ব (Footor Measure) বলে।

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদে এল / বান ॥

- এখানে চারটি পর্ব আমরা দেখতে পাই।

সাধারণত পর্ব তিন প্রকার - পূর্ণ পর্ব, অপূর্ণ পর্ব এবং অতিপর্ব।

প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে-"অর্ধযতি দ্বারা খন্ডিত পঙ্‌ক্তি হল পদ এবং লঘু যতি দ্বারা খন্ডিত পদ হল পর্ব।

পদ ঃ অর্থ যতি দ্বারা বিভাজ্য চরণাংশকে পদ বলে। এইপদ - ক) দুটি সমান মাপের পূর্ণ পর্বের সমন্বয়ে, খ) কখনো কখনো তিনটি মাপের পূর্ণ পর্বের সমন্বয়ে, গ) কখনও একটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্বের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

লয় ঃ লয় মানে হল গতি। কবিতা পাঠকালে পঠনের গতিভঙ্গি হতে যে সুরের সৃষ্টি হয়, তাকে লয় বলে।

সব কবিতা একই গতিতে পড়া যায় না। কোনো কবিতা ধীর গতিতে পড়া হয়, আবার কোনো কবিতা দ্রুত গতিতে পড়া হয়। ছন্দ বিচারে কবিতা পাঠের এই গতিকে বলা হয় লয়।

লয় তিন প্রকার - ১. দ্রুত লয়, ২. মধ্যম লয়, ৩. ধীর লয়

চরণ ঃ পূর্ণ যতির দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনি প্রবাহকে চরণ বলে। চরণ মাত্রেই এক বা একাধিক পর্ব থাকে।

স্তবক ঃ কবিতায় চরণগুচ্ছ নিয়ে যে সুশৃঙ্খল ছন্দগ্রন্থি রচিত হয় তাকে স্তবক বলে।

মিল ঃ একাধিক পর্ব বা পদ বা চরণের অন্তিম ধ্বনি সাম্যকে মিল বলে।

ছত্র, পর্বাঙ্গ ও প্রস্বর ঃ গদ্যের লাইন বা চোখে দেখা লিখিত লাইন হল ছত্র। পর্বের অন্তর্ভুক্ত যে শব্দগুলোর সহায়তায় ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাদের বলা হয় পর্বাঙ্গ।

কোনো কোনো চরণের এক একটি পর্বে আদি অক্ষরের উপর যে সুস্পষ্ট জোর বা বল দেওয়া হয়, তাকে শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর বলে।

প্রস্বর এর চিহ্ন - (')

ছন্দের প্রকৃতি

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি, অক্ষর, ছেদ ও যতি, পর্ব ও পর্বাঙ্গ, মাত্রা, শ্বাসাঘাত, লয়, পদ ও চরণ, স্তবক ও মিলের সাহায্যে যে বাংলা ছন্দ সৃষ্টি হয় তার প্রকৃতি ত্রিবিধ -

১. স্বরবৃত্ত, ২. মাত্রাবৃত্ত, ৩. অক্ষরবৃত্ত

স্বরবৃত্ত ছন্দ ঃ যে কাব্য ছন্দের মূল পর্ব শুধু চার মাত্রার হয় এবং যার লয় দ্রুত থাকে তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলে। এই ছন্দের প্রতিপর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসের আঘাত ঘটে বলে একে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দও বলে। এই ছন্দকে দলবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দও বলে (Syllable Metre)।

বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ ঃ

১. এই ছন্দের মূলপর্ব চারমাত্রার হয়।

২. প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে একটা শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর থাকে।

৩. যে কোন অক্ষর এক মাত্রার হয়।

৪. যুক্ত ব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়।

৫. দ্রুত লয় থাকে।

৬. দল সংখ্যা দ্বারাই মাত্রা সংখ্যা নির্ধারিত হয়। দলের সংখ্যা ও মাত্রা সমান।

৭. এই ছন্দ শ্রুতিমধুর হয়।

৮. প্রতিটি চরণে সাধারণত চারটি পর্ব থাকে। অনেক সময় শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই ছন্দরীতিতে দুই, তিন, চার ও পাঁচ পর্বের চরণও রচনা করেছেন।

৯. এটি ছড়া জাতীয় বা কবিতা লেখার বিশেষ উপযোগী ছন্দ।

উদাহরণ ঃ

১ ১১১   ১১১১১   ১ ১ ১১   ১১
হেড অফিসের / বড়ো বাবু / লোকটি বড়ো / শান্ত।   ৪+৪+৪+২

১ ১ ১ ১   ১ ১ ১১   ১ ১১১   ১ ১
তার যে এমন / মাথার ব্যামো / কেউ কখনো / জানত ॥   ৪+৪+৪+২

পর্ব - পূর্ণ পর্ব চার মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব দুই মাত্রার

চরণ - চার পর্বের চরণ (তিনটি পূর্ণ পর্ব এবং একটি অপূর্ণ পর্ব)

স্তবক - দুই চরণের স্তবক

মাত্রা গণনা পদ্ধতি - স্বরান্ত অক্ষর একমাত্রা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর একমাত্রা

লয় - দ্রুত

চিহ্ন - স্বরান্ত অক্ষর = ১ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর = ১

মিল - চরণান্তিক মিল

প্রকৃতি - স্বরবৃত্ত ছন্দ

ছন্দ নির্ণয় ঃ

১ ১১ ১   ১ ১ ১ ১   ১ ১১১   ১
বাঁশ বাগানের / মাথার উপর / চাঁদ উঠেছে / ওই।   ৪+৪+৪+১

১ ১ ১ ১   ১ ১ ১১   ১ ১ ১ ১   ১
মাগো আমার / শোলক বলা / কাজলা দিদি / কই ॥   ৪+৪+৪+১

পর্ব - পূর্ণ পর্ব চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব একমাত্রার

চরণ - চার পর্বের চরণ (প্রথম তিন পর্ব চার মাত্রার এবং শেষের পর্বটি এক মাত্রার)

স্তবক - দুই চরণের স্তবক

মাত্রা গণনা পদ্ধতি - স্বরান্ত অক্ষর ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর উভয়েই একমাত্রা

লয় - দ্রুত

মিল - চরণান্তিক মিল, **প্রকৃতি** - স্বরবৃত্ত

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঃ যে কাব্য-ছন্দের মূলপর্ব চার, পাঁচ, ছয়, সাত মাত্রার হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলাবৃত্ত ছন্দ (Simple Moric Metre) বলে। একে ধ্বনি প্রধান বা বিস্তার প্রধান ছন্দও বলা হয়ে থাকে। এই ছন্দে শব্দ ধ্বনিই শোনা যায়, তার অতিরিক্ত কোনো সুর বা তান ধরা পড়ে না।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১. মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয়, সাত মাত্রার হয়।

২. শব্দ ধ্বনি-ই থাকে; তার অতিরিক্ত সুর বা তান থাকে না।

৩. হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত বা যৌগিক স্বরসর্বস্ব অক্ষর শব্দের যেখানেই থাকুক না কেন, তা দুই মাত্রার হবে।

৪. যুক্ত ব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে পূর্ববর্তী অক্ষরকে দীর্ঘ ও দুই মাত্রার করে।

৫. মধ্যম লয় থাকে।

৬. এই ছন্দের চরণের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এক রকমের ধ্বনি ঝঙ্কার অনুভব করা যায়।

৭. অনুস্বার (ং) এবং বিসর্গ (ঃ) যুক্ত হয়ে যে রুদ্ধ দল তৈরি হয় এই ছন্দরীতিতে সেগুলোকে দুই মাত্রা ধরা হয়।

৮. এই ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী মুক্তক প্রভৃতি নানা রীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা হয়।

উদাহরণ ঃ

২১১১ ২ ২ ১১ ২১১১১ ২
দুর্গম গিরি / কান্তার মরু / দুস্তর পারা / বার। ৬+৬+৬+২

২১১১১ ২ ১১১১ ২১১১১ ২
লঙ্ঘিতে হবে / রাত্রি নিশীথে / যাত্রীরা হুশি/য়ার ॥ ৬+৬+৬+২

পর্ব - পূর্ণপর্ব ছয় মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব দুই মাত্রার

চরণ - চার পর্বের চরণ (প্রথম ৩ টি পূর্ণ পর্ব এবং শেষেরটি অপূর্ণ পর্ব)

স্তবক - দুই চরণের স্তবক

মাত্রা গণনা পদ্ধতি - মুক্তাক্ষর একমাত্রা, রুদ্ধাক্ষর দুইমাত্রা

লয় - মধ্যম লয়

প্রকৃতি - মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঃ যে কাব্য ছন্দের মূলপর্ব আট বা দশ মাত্রার হয় এবং শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা তান থাকে তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বা মিশ্রকলাবৃত্ত (Mixed Moric Metre) ছন্দ বলে। ধীর লয়ে এই ছন্দ পাঠ করতে হয়। একে যৌগিক ছন্দ বা পয়ার বা পয়ার জাতীয় ছন্দও বলা হয়ে থাকে। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মতে এটি 'তান প্রধান' ছন্দ - কেননা, এই জাতীয় ছন্দে ধ্বনি প্রবাহের মধ্যে একটি সুরের টান বা তান (Vocal drawal) থাকে, যা অনেক সময় অক্ষর ধ্বনিকেও অতিক্রম করে যায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১. মূল পর্ব আট বা দশ মাত্রার হয়।

২. শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা তান বা সুর থাকে।

৩. শব্দের শেষে হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দুই মাত্রার হয়। একাক্ষর শব্দের অক্ষরটি ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত হলে তাতেও দুই মাত্রা হয়। অন্য সমস্ত অক্ষর এক মাত্রার হয়।

৪. সমাসবদ্ধ শব্দের আদিতে যদি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর থাকে এবং তা যদি একটি শব্দ হয় তবে তা কখনো কখনো দুই মাত্রা ধরা হয়।

৫. যুক্ত ব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়। তাই পূর্ববর্তী অক্ষর দীর্ঘ ও দুই মাত্রার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

৬. ধীর লয় থাকে।

৭. এই ছন্দরীতির একটি প্রধান বিশেষত্ব হল এর শোষণ ক্ষমতা। শোষণ ক্ষমতা হল পঙ্‌ক্তির মধ্যে পর্বে পর্বে রুদ্ধদলকে সংকুচিত করে স্থান দেওয়ার ক্ষমতা।

৮. এই প্রকার ছন্দরীতিতে আয়তনগত বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এই রীতিতে ছন্দরূপের বৈচিত্র্য দেখা যায় যেমন - পয়ার, মহাপয়ার, মুক্তক ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ

১১১ ১১১১১ ১ ২ ১১১
মরিতে চাহিনা আমি / সুন্দর ভুবনে। ৮+৬

১১ ২ ১১ ১১ ১১১১ ২
মানবের মাঝে আমি / বাঁচিবারে চাই ॥ ৮+৬

পর্ব - পূর্ণ পর্ব আট মাত্রার অপূর্ণ পর্ব ছয় মাত্রার

চরণ - দুই পর্বের চরণ (প্রথমটি পূর্ণ পর্ব দ্বিতীয়টি অপূর্ণ পর্ব)

স্তবক - দুই চরণের স্তবক

মাত্রা গণনা পদ্ধতি - শব্দের শেষে হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দুই মাত্রা হয়। একাক্ষর শব্দের অক্ষরটি ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত হলে তাতেও দুইমাত্রা হয়। অন্যসব অক্ষর একমাত্রার হয়।

লয় - ধীর লয়

মিল - পর্বান্তিক মিল

প্রকৃতি - অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখো : মান–৬

১. স্বরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ

২. বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর ঃ

৩. অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ

ছন্দ নির্ণয় করো

১. মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

উত্তর ঃ

২. কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।

তাই তো খুকু রাগ করেছে ভাত খায়নি কাল ॥

উত্তর ঃ

৩. ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।

যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর ॥

উত্তর ঃ

৪. পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী।

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ॥

উত্তর ঃ

৫. তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো ॥
উত্তর ঃ

৬. বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি
চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি।
উত্তর ঃ

৭. ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ সে
উত্তর ঃ

৮. কৃষকের শিশু কিংবা রাজকুমার
সবারই রয়েছে কাজ বিশ্বমাঝার
উত্তর ঃ

৯. কেমন করে বীর ডুবুরী সিন্ধু সেঁচে মুক্তো আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।
উত্তর ঃ

১০. তাজমহলের পাথর দেখেছ; দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী; বাহিরিতে সা-জাহান।
উত্তর ঃ

১১. গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
তীরে একা বসে আছে নাহি ভরসা
উত্তর ঃ

*****

একক – ৫

প্রবন্ধ রচনা

বিঃ দ্রঃ
প্রতিটি প্রবন্ধের পয়েন্টগুলি দেওয়া হয়েছে।
শিক্ষার্থীরা পয়েন্টগুলি তথ্যসহ বিশ্লেষণ করলেই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে পরিণত হবে।

১. ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

- ভূমিকা - অবস্থান ও মানচিত্রগত রূপ - পাহাড়-পর্বতে ত্রিপুরা - ত্রিপুরার নদ নদী - অরণ্যের শোভা - অরণ্যপ্রাণী - বিভিন্ন ঋতুতে ত্রিপুরার প্রকৃতি - পাহাড়ের গায়ে ঝরণাধারা - বাহাড়ী ফুলের সমারোহ - অপরূপ দৃশ্য বড়মুড়ার চূড়া - ত্রিপুরার ছোটো ছোটো প্রাকৃতিক হ্রদ - তীর্থমুখের নৈসর্গিক শোভা - প্রাকৃতিক স্টেডিয়াম - অন্যান্য প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থান - উপসংহার।

২. ত্রিপুরার অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণী

- ভূমিকা - অরণ্য গড়ে ওঠার কারণ - অরণ্যভূমির পরিমাণ - অরণ্যের ধরন - অরণ্যের গাছপালা - গাছপালার ব্যবহার - অরণ্যের বাঁশ ও বেত - বাঁশ বেতের ব্যবহার - ছন-উলু-ফুলঝাড়ু - অন্যান্য অরণ্য সম্পদ - অরণ্য প্রাণী - অরণ্যের পাখি ও সরীসৃপ - অরণ্য প্রাণী সংরক্ষণে অভয়ারণ্য - বনোন্নয়ণ ও বনায়ণ কর্পোরেসন - উপসংহার।

৩. ত্রিপুরার উৎসব ও মেলা

- ভূমিকা - উৎসবের উৎপত্তি - ত্রিপুরায় উৎসবের উৎপত্তি - গড়িয়া পূজা - খারচি পূজা - কের পূজা - বিঝু উৎসব - গঙ্গা পূজা - দুর্গাপূজা - দেওয়ালী পূজা - বাঙালিদের পূজা - অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসব - ত্রিপুরার অন্যান্য উৎসব - শিল্প-বিজ্ঞান ও বইমেলা - উপসংহার।

৪. ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রেলসম্প্রসারণ

- ভূমিকা - স্বাধীনতার পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা - স্বাধীনতা লাভের পর যোগাযোগ ব্যবস্থা - যোগাযোগ ব্যবস্থার অনগ্রসরতার কারণ - যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন - সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা - আকাশ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা - রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা - রেল সম্প্রসারণের সম্ভাবনা - রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা - যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা - যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের আবশ্যকতা - যানবাহনের অব্যবস্থা - সরকারি উদ্যোগ - উপসংহার।

৫. ত্রিপুরার পর্যটন শিল্প ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

- ভূমিকা - পর্যটন স্থান হিসেবে রাজপ্রাসাদ - পর্যটন স্থান হিসেবে সিপাহীজলা - পর্যটন স্থান হিসেবে ঊনকোটি - পর্যটন স্থান হিসেবে পিলাক - পর্যটন স্থান হিসেবে নীরমহল - পর্যটন স্থান হিসেবে চতুর্দশ দেবতা মন্দির - পর্যটন স্থান হিসেবে ডম্বুরতীর্থ - পর্যটন স্থান হিসেবে মন্দিরঘাট ও নারিকেলকুঞ্জ - পর্যটন স্থান হিসেবে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির - পর্যটন স্থান হিসেবে জম্পুই - পর্যটন স্থান হিসেবে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য - অন্যান্য দর্শনীয় স্থান - ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পকেন্দ্র - ত্রিপুরায় দেশী ও বিদেশী পর্যটক - পর্যটন শিল্প বিকাশে প্রতিবন্ধকতা - পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা - সরকারি উদ্যোগ - উপসংহার।

৬. ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার,

৭. ত্রিপুরার শিল্পোন্নয়ন সমস্যা ঃ প্রতিকার ও সম্ভাবনা,

৮. ত্রিপুরার ঋতু বৈচিত্র্য,

৯. অন্ধত্ব - অজ্ঞতা - কুসংস্কার দূরীকরণে বিজ্ঞানের ভূমিকা,

১০. পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার,

১১. ছাত্র জীবনে খোলাধুলার গুরুত্ব / প্রয়োজনীয়তা,

১২. দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব,

১৩. তোমার প্রিয় সাহিত্যিক,

১৪. মাদার টেরেসা - এক মহীয়সী নারী,

১৫. রক্তদান জীবন দান / রক্তদান ঃ এক মহান কর্তব্য,

১৬. স্বামী বিবেকানন্দ ঃ একজন মহাপুরুষ,

১৭. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস,

১৮. ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি,

১৯. মহাত্মা গান্ধি।

২০. ত্রিপুরার উৎসব ও মেলা।

নমুনা প্রশ্ন

বিভাগ - ক

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ **১x২০=২০**

১. "ঘুচিয়ে দে ভাই" - কী ঘোচানোর কথা বলা হয়েছে?

২. "ধরায় ধরেনা হর্ষ" - কার আগমনে ধরা আনন্দে ভরে ওঠে?

৩. আজ কীসের যুগ বলে কবি মন্তব্য করেছেন?

৪. কবি কোন্ অঞ্চলে বীজ বোনার পরামর্শ দিয়েছেন?

৫. কারা লড়াই করে?

৬. মর্মরধ্বনি কোথায় বাজে?

৭. "দুই-ই বাহুবলের বীর্য" - এখানে লেখক কাদের বীর্যের কথা বলেছেন?

৮. সকল কথায় কবিকে কী যোগ করতে হয়?

৯. "সে কী মধুর হাসি" - মধুর হাসিটি কার?

১০. 'এমনই মন্ত্রের জোর' - এখানে কোন্ মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে?

১১. 'একসূত্রে গাঁথা যায়না' - কাদেরকে একসূত্রে গাঁথা যায়না?

১২. "কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা" - বড়ো কথাটি কী?

১৩. বিমলকে নিয়ে বেঙ্গলি ক্লাবে কী আলোচনা হত?

১৪. শ্যামবাবুর শ্রমহারক যন্ত্রটির নাম কী?

১৫. হিঙের গন্ধ কোথা থেকে আসছিল?

১৬. 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থটি কার লেখা?

১৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্যটির নাম কী?

১৮. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কার লেখা?

১৯. দীনবন্ধু মিত্র এর রচিত শ্রেষ্ঠ নাটকটির নাম কী?

২০. 'বাংলার স্কট' কাকে বলা হয়?

বিভাগ - খ

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ (৬০ থেকে ৮০ শব্দের মধ্যে) **৩x৭=২১**

২১. "চিরযুবা তুই যে চিরজীবী"

- কবি কাকে, কেন 'চিরযুবা ও চিরজীবী' বলেছেন? ১+২=৩

২২. "কোন্ হবে বারবার বর্বর এই অভিনয়?"

- কোন্ রচনার অন্তর্গত? এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২=৩

২৩. " সাগরও জল শিশিরবিন্দুও জল"

- উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনার অংশ? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+২=৩

২৪. "আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি।"

- কে, কাকে উক্তিটি বলেছেন? এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+২=৩

২৫. 'সমীভবন' কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো। ৩

২৬. 'লোকনিরুক্তি' এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ লেখো। ৩

২৭. নাসিক্যীভবন কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো। ৩

বিভাগ - গ

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (১২০ শব্দের মধ্যে) **৫x৩=১৫**

২৮. 'নারী' কবিতা অবলম্বনে কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে সাম্যবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

অথবা, "ওরি মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ" - কোন্ রচনার অংশ? 'ওরি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? লাইনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+১+৩=৫

২৯. "বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে" - কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? কবিত্ব সাধনার সাথে বৈজ্ঞানিকের সাধনার কী মিল লেখক লক্ষ্য করেছেন তা আলোচনা করো। ১+৪=৫

অথবা, "অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে"

- উদ্ধৃতাংশটি কোন্ রচনার অন্তর্গত? 'জমে থাকা পাপ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? পাপকে কীভাবে সাফ করা যাবে বলে লেখক মনে করেন? ১+২+২=৫

৩০. "জগদ্দলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়াটা ষড়যন্ত্র করেছে" - উক্তিটি কোন্ রচনার অন্তর্গত? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। বক্তার এরূপ উক্তির কারণ কী? ১+১+৩=৫

অথবা, 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটিতে জোচ্চুরি ব্যবসার প্রতি যে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে গল্প অবলম্বনে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৫

বিভাগ - ঘ

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (১৫০ শব্দের মধ্যে) ৬x২=১২

৩১. গীতিকাব্য কাকে বলে? বাংলা গীতিকাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করো। ২+৪=৬

অথবা, বাংলা কাব্যসাহিত্যে জীবনানন্দের কাব্য প্রতিভা আলোচনা করো। ৬

৩২. উদাহরণসহ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করো। ৬

অথবা, ছন্দলিপি নির্ণয় করো ঃ ৬

কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তো আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।

বিভাগ - ঙ

৩৩. যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো (৪৪০ শব্দের মধ্যে) ১x১২=১২

ক) ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার

খ) রক্তদান : জীবনদান

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ছাত্রসমাজের ভূমিকা

ঘ) মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ

*****